শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ

বিনয় ঘোষ

শিল্পী ঃ

ছবি ঃ পিসিয়েল্‌

সূর্য্য রায়

চিত্তপ্রসাদ

প্রচ্ছদপট ঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রসঙ্গ-সূচী

চিত্র-সূচী

শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ

নানাবিধ লঘুগুরু বিষয়ের কয়েকটি আলোচনা ও সমালোচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হ'ল। 'যুগান্তর সাময়িকী'তে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি এবং অন্যান্য মাসিকপত্রে কয়েকটি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে। এ-ছাড়া অপ্রকাশিত রচনাও কয়েকটি আছে এর মধ্যে।

প্রকাশ করার একমাত্র কৈফিয়ৎ হ'ল, রচনাগুলি ঠিক 'টপিকাল্' নয়, বরং 'টিপিকাল্'। শুধু টপিকাল্ হ'লে বা সাংবাদিকতা হ'লে হয়ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করতাম না। অবশ্য প্রয়োজন অনুভব করেছি বলেই যে গ্রন্থাকারে প্রকাশযোগ্য তা বলছি না। সে-বিচারের ভার আপাততঃ যাঁরা কষ্ট ক'রে পড়বেন তাঁদের উপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলাম।

আলোচিত বিষয়গুলি লঘুগুরু। অর্থাৎ লঘুবিষয় গুরুভঙ্গীতে, আবার গুরুবিষয় লঘুভঙ্গীতে বলা। পড়লে হাসিও পাবে, কান্নাও পাবে, আবার প্রচণ্ড রাগও হবে। কি হবে না-হবে সঠিক বলা মুস্কিল, তবে 'কুলীন' সাহিত্যিক কেউ যেন এর মধ্যে অনর্থক 'মৌলিক' কিছু সন্ধান না করেন। এ একেবারে জল-অনাচরণীয় শ্রেণীর, কুলীনও নয়, মৌলিকও নয়।

খ্যাতনামা শিল্পী পিসিয়েল্, সূর্য্য রায় ও চিত্ত-প্রসাদ এই বইয়ের জন্যে ছবি এঁকে যে-মর্য্যাদা

দিয়েছেন, হয়ত বইখানির তা প্রাপ্য নয়। তবু তাঁরা যখন এঁকেছেন, অনুরোধেই হোক আর অনুপ্রেরণাতেই হোক, তখন তাঁদের কাছে ঋণী রইলাম। ঋণশোধ আমার স্বভাববিরুদ্ধ। ছবিগুলি এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

'বেঙ্গল পাবলিশার্স'-এর পরিচালক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ও প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমার চাইতে তাঁরাই বেশী এই রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শিল্পী চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

শেষে, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করছি। তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করছি না, কৃতজ্ঞও থাকছি না। কারণ, লেখকদের উৎসাহ দেওয়া ও লালন করাই তাঁর একমাত্র মহৎ কাজ, আজ থেকে নয়, "কল্লোল"-এর কাল থেকে। স্বার্থ কি তাঁর আছে জানি না, কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই। এই গ্রন্থের নানাবিধ ঘষামাজার কাজ তিনিই করেছেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ **বিনয় ঘোষ**

কলিকাতা

১

পাঁকাল-বন্দনা
মধ্য-বিত্ত
মধ্য-চিত্ত
নববাবুকথা
কল্‌কেত্তা কাল্‌চার
'Q'
প্রতিদিন
কাক-কয়লা

পাঁকাল-বন্দনা

"পাঁকের মাঝে বসত্, তবু
পাঁক লাগে না গায়ে তার
ধর্‌তে গেলে পিছ্‌লে চলে,
ধন্য পাঁকাল নির্ব্বিকার।"

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভগবান !

এবার আর তোমার দূতের প্রতীক্ষায় থাকিনি। তোমার কল্কি-অবতার হয়ত মধ্যপথে কল্কের টানে অচৈতন্য; কিন্তু আমরা কোন অবতারের আবির্ভাবের অপেক্ষায় তোমার ক্ষমার বাণী, ভালবাসার বাণী, বিদ্বেষ-বিষ বিসর্জ্জনের বাণী ভুলিনি। আমরা ভারতবাসী, আমরা বাঙ্গালী, ক্ষমা করেছি সকলকে, ভালবেসেছি সকলকে। তার

সাক্ষী, শকুনভরা বাংলার গ্রাম, আর রঙ্গভরা 'চৌরঙ্গী'। তার প্রমাণ মেদস্ফীত, অর্থস্ফীত স্বদেশের পণ্য ও খাদ্যব্যবসায়ীরা স্মিতমুখে লক্ষ লক্ষ নরকঙ্কালের পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপের উপর আজও সগর্ব্বে সমাসীন। তার প্রমাণ এই মহানগরীর ডান দিকের ফুটপাথের উপর দিয়ে আমরা হাসি, খেলি, গান গাই, শীস দিই, সিনেমায় যাই, বসুন্ধরার অপ্সরী-আলয়ে চোরাবাজারের খুনের টাকা খোলামকুচির মতো উড়িয়ে দিই, আর বাঁ দিকের ফুটপাথ থেকে বাসি মৃতদেহের দুর্গন্ধ আসে নাকে, মুমূর্ষু নরনারী শিশুর আদিম বুভুক্ষার্ত্তনাদ কানে পৌঁছয়। আমরা শিউরে উঠি না, থমকে দাঁড়াই না, জোরে জোরে পা ফেলি, নাকে রুমাল দিই। আমাদের নার্ভের কাঁটাতার ভেদ ক'রে ওরা কোনদিন অন্তরের দুর্গদ্বারে পৌঁছতে পারেনি। তাই আমরা 'ফ্যান' দিয়ে মানবকল্যাণের গর্ব্ব বোধ করেছি, ওরাও আমাদের ক্ষমা ক'রে ধুঁকে ধুঁকে অদৃষ্টকে অভিশাপ দিয়ে মরে গিয়েছে। তাই আমরা হঠাৎ-মনুষ্যত্বের গলা-ধাক্কায় লঙ্গরখানা খুলেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে গিয়েছি দানের অর্থ নিয়ে। ওরা নীরবে সেই দান গ্রহণ করেছে, তারপর পরম নিশ্চিন্তে সভ্য মহানগরীর ফুটপাথে ও হাসপাতালে দেহত্যাগ করেছে। তবু বাঁ দিকের ফুটপাথ ছেড়ে মধ্যের রাজপথের ট্র্যাফিক ও জনস্রোত ঠেলে ওরা ডান দিকে এগিয়ে আসে নি। একবারও প্রশ্ন করেনি, মাঠের ধান তুলে দিলাম গোলায়, গোলা থেকে সে-ধান গেল কোথায়? ওরা অসভ্য, ওরা অশিক্ষিত, তাই দেশী প্যাঁকালের দালালেরা ওদের বুঝিয়েছে—এসব জ্যামিতি, এ্যাল্‌জাবরা, স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌, আমদানি-রপ্তানি, ইন্‌ফ্লেশনের ভেল্‌কিবাজি, লাঙ্‌লা চাষার মগজে

মজুতদার

পিসিয়েল

প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। ধন্য পাঁকাল তুমি! সুদের পাঁকে, মুনাফার পাঁকে, চোরাবাজারের পাঁকে, গোপন মজুতের পাঁকে হাবুডুবু খেয়েও তুমি 'পঙ্কিল' নও, পাঁকাল, পাকমুক্ত তেলচুক্‌চুকে পাঁকালটি! ···

হে অমৃতের পুত্ররা! পাঁকালের যুক্তি শোনো, আর পাঁকালের উমেদার মাকাল মধ্যবিত্তের যুক্তি। পাঁকাল আছে গা-ঢেকে পাঁকের মধ্যে, ব্ল্যাক্‌আউট্ রাতে তাকে চেনাই যায় না। পাঁকালের দালালেরা আছে বাইরে, তাদের নাম 'মাকাল মধ্যবিত্ত'। বাইরে শুধু আজ এই দালালের দৌরাত্ম্য! রাস্তার মোড়ে, হোটেলে, সিনেমায়, ক্লাবে, অফিস-আদালতে—সর্ব্বত্রই আজ এই পাঁকালের দালালদের ভিড়। কথায় চোরাবাজার, চলায় চোরাবাজার, স্বপ্নে চোরাবাজার! বর্ম্মার চাল নেই, গুর্খা চাল গিল্‌ছে, তাই তো তেতাল্লিশ সালের গোড়া থেকে সাত-আট মাসে চালের দর বাড়ল তিন-চার গুণ থেকে সাত-আট গুণ। পাঁকালের যুক্তি এই, আর মধ্যবিত্ত দালালেরও : ২৮ কোটি মণ চাল চাই আমাদের, শস্যশ্যামলা বঙ্গজননী ২৪ কোটি মণ ফলিয়ে দেন, কিন্তু হায়! বাকি ৪ কোটি মণ সারা ভারতবর্ষ তাকে ভিক্ষে দিতেও অসমর্থ হ'লো, আর তারই অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক সশরীরে স্বর্গে গেল। পাঁকালের মুনাফাবৃদ্ধির ছলাকলায় আকাল এল দেশে, পাঁকালের গায়ে কিন্তু ছিটেফোঁটা পাঁকও লাগল না। পাঁকালের জোর আছে, কারণ দেবতাদের সঙ্গে পাঁকালের সন্ধি! মর্ত্ত্যের অরাজকতায় দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে যতই অর্ডিন্যান্স জারি করেন, পাঁকাল ততই পাঁক থেকে গভীরতর পাঁকে পিছ্‌লে যায়। দৈত্য-দমনে ও নিধনে

যে-দেবতাদের গৌরব আজও অম্লান, যে-দেবতাদের গুপ্তচরের দৃষ্টি নারীর বক্ষঃস্থল থেকে দৈত্যকুলের গোপন ষড়যন্ত্রের নথিপত্র আবিষ্কার করে, সেই দেবতারা অনুচরবর্গসহ ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরলেন। পাঁকাল পুষ্করিণীর গভীর পাঁকে অদৃশ্যই থেকে গেল। ধন্য পাঁকাল! ···

পঙ্ক-আহার, পঙ্ক-বিহার, চামড়া তবু চকচকে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছে কে? পাঁকাল তুমি, আর তোমার আশ্রয়দেবতা শাসক মহাপ্রভু। লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুকে নির্ব্বিকার চিত্তে অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে কে? পাঁকমুক্ত পাঁকাল তুমি, আর তোমার ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মরাজ। বিনা ওষুধে, বিনা চিকিৎসায় হাজার হাজার লোকের অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? পঙ্কজীবী পাঁকাল তুমি। আমরা তোমায় ক্ষমা করিনি তো ক্ষমা করেছে কে? তুমি কি দেখনি পাঁকাল, আমরা ধুঁকে ধুঁকে, কাতরে কাতরে নিঃশব্দে মরেছি, অভিযোগ করিনি, প্রতিবাদ করিনি? তুমি কি দেখনি পাঁকাল, মহানগরীর একদিকে মহাদুর্ভিক্ষের মৃত্যু বিভীষিকা, আর একদিকে গলাগলি, ঢলাঢলি, ঠাট্টা-তামাসা, রসিকতা, চোরা-বাজারের লুটের পয়সায় রাসলীলার মহোৎসব। বাংলার এমন মূর্ত্তি দেখিনি কোনদিন। সে তো তোমারই কৃপায় পাঁকাল! একদিকে বাংলা মায়ের ধূমাবতী মূর্ত্তি। ধূম্রবর্ণা, মলিনাম্বরা, বিমুক্তকুন্তলা, রুক্ষা, কাকধ্বজ রথারূঢ়া, বিলম্বিত পয়োধরা, সূর্পহস্তা, রক্তনয়না, লম্বনাসিকা, ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা বঙ্গমাতা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মহানগরীর পথে পথে ঘুরে বেড়ায়; আর একদিকে মায়ের বাঈজী-মূর্ত্তি,

নাচ-গান-নেশা-হল্লায় মশগুল। এ-সমাজে তাই তুমি দানবও নও, কুমীরও নও, তুমি কলি-যুগের পাঁকাল-অবতার।

মাঠে মাঠে মানুষের মৃতদেহ মাটির সঙ্গে মিশে গেল। কঙ্কালের মজ্জার সারে বন্ধ্যা বাংলার মাটির ফলন-শক্তি বাড়ল। তবু প্রমাণ হ'ল না পাঁকাল যে দেশে মহামন্বন্তর এসেছে। কলকাতা থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে লণ্ডন-ওয়াশিংটন্, সর্ব্বত্র তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হ'ল মোটর-দুর্ঘটনার মতো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে মাত্র, দুর্ভিক্ষ হয়নি। সত্যিই তো দুর্ভিক্ষ হয়নি। তার কারণ বা যুক্তি একটা-আধটা নয়, অজস্র। যেমন :

(১) প্রজার দুর্ভিক্ষে রাজার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। রাজার ধর্ম্ম নষ্ট হ'লে ধর্ম্মযুদ্ধে জয় হয় না। ধর্ম্মযুদ্ধে রাজার জয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয়নি।

(২) সুসভ্যদের মহাসভায় সকল সভ্যই দিব্য চক্ষে দেখেছেন যে দুর্ভিক্ষ হয়নি। অসভ্যদের মধ্যে যদি হয়ে থাকে, তা হ'লে তা ধর্ত্তব্যই নয়।

(৩) সেরেস্তায়, আইন-কানুনে, দলিল-দস্তখতে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ নেই। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয়নি।

(৪) দুর্ভিক্ষ হ'লে কেউ রক্ষিতা রাখত না, মোকদ্দমা করত না, পিপে পিপে মদ্য পান করত না, তাড়াতাড়া নোটের তুবড়ীবাজী দেখাত না, সব অর্থ দান করত লঙ্গরখানায়। দেশের লোক খেয়ে বাঁচত। কিন্তু তা বাঁচছে না, যা বাঁচছে তা সামান্য। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয়নি।

(৫) দুর্ভিক্ষ হ'লে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হ'ত, সকলে চিঁ চিঁ করত। কিন্তু হ্রেষারবে আকাশ বিদীর্ণ হ'চ্ছে, সভাসমিতি অবিরাম চলছে, বক্তার বিরাম নেই। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয়নি।

(৬) সবার উপরে, দুর্ভিক্ষ হ'লে 'মানুষ' মরত। কিন্তু মানুষের মতো মানুষ একটাও মরেনি, তারা সকলেই বাঁচার মতো বেঁচে আছে। আর যারা মরেছে তারা 'মানুষ' নয়। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয়নি।

পাঁকাল, তোমার ভয়ডর নেই। ব্ল্যাক্-আউট্ রাতে, ব্ল্যাক-মার্কেটের ডোবার পাঁকে গা ডুবিয়ে তুমি বসে' থাক। তোমার মাথার উপর বটের ছায়ায় তোমার ডোবার অন্ধকার, পাঁকের অন্ধকার আরও গাঢ়তর হবে। তৃণদলের সাধ্য কি তোমায় স্পর্শ করে?

পাঁকাল! হাজারে হাজারে, লাখে লাখে আমরা মরেছি, তবু আমরা একেবারে মরিনি আজও। মহানগরীর আনাচে-কানাচে, বিশাল সুরম্য হর্ম্ম্যমালার ইটের পাঁজরে পাঁজরে, গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে আজও আমরা বেঁচে আছি। পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে তোমাদের সভ্য মহা-নগরীর মহানুভবতার মুখাপেক্ষী হয়ে এসেছিলাম। আগে জানিনি, আগে বুঝিনি, এত লোহা, এত ইস্পাত, এত মার্ব্বেলপাথর এই মহানগরীতে। আগে বুঝিনি যে, মহানগরীর বিরাট অট্টালিকার মত নির্জ্জীব, নিঃস্পন্দ মহানগরীর মানুষগুলোও জঘন্য, ঘিন্‌জি বস্তির মতোই তাদের অন্তরের কদর্য্যতা। লোহা-ইস্পাতের হৃৎপিণ্ডে আমাদের গ্রাম্য নাকিকান্না তাই নিষ্ফল আঘাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। তাই ফিরে চললাম আমরা। লঙ্গরখানায় প্রাণশক্তি অপচয় করে তিলে তিলে নিঃশেষিত না হয়ে ফিরে চল্‌লাম। একবার শেষ চেষ্টা করে

দেখি বাংলার মাটি মহানগরীর ইস্পাতের মতো অসাড় কি না, আমাদের মৃত কঙ্কালের মতো হিম, নিঃস্পন্দ কি না? আবার আমরা ফিরে আসব, এই মহানগরীতেই। স্বপ্ন দেখার শক্তি নেই আজ, তবু পাঁকাল, মনে রেখো এ কোন ব্যাধির বিকার নয়। সেদিন মহানগরীর ইস্পাতও স্পন্দিত হবে, পাথরের বুকেও শিহরণ জাগবে। মুমূর্ষুর দুঃস্বপ্ন নয়, জীবনের স্বপ্ন। পাষাণ অহল্যা নবজীবন লাভ করবে। ··

ততদিন শুধু ক্ষমা নয় পাঁকাল, ততদিন শুধু ভালবাসা নয়। ততদিন শুধু কঙ্কালের বেদীতে যোগাসনে বসে নরমুণ্ড-বেষ্টিত হয়ে প্রতিহিংসার পৈশাচিক সাধনা, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার তান্ত্রিক উপাসনা। কবিতা নয়, কল্পনা নয়, শাশ্বত শিল্প-সৃষ্টি নয়, মুহূর্তের ও প্রত্যহের নিষ্ঠুর সংগ্রাম-সাধনা।

"একা চাকাভাঙা কাককেতু রথে
ভ্রমে ধূমাবতী বুভুক্ষাপথে,
বুঝেছ?
গগনবিহারী সে কাককণ্ঠে
হে কবি, তোমার
কোকিল-কূজন কূজেছ?"

কবিতার দিন আসবে, মহৎ শিল্প-সৃষ্টির দিন আজ নয়, আগামী কাল। আজ কাককণ্ঠে কোকিল-কূজন কি ভাল লাগে?

"অতি ক্ষুণ্ময়ী ধূমাবতী ওই
রথ ছেড়ে চলে হাঁটিয়া
রূপে রসে ভরা বিচিত্র ধরা
মুছে ফেলে জিভে চাটিয়া।"

আজ তাই 'রূপে রসে ভরা বিচিত্র ধরা'র রূপ-সাধনা নয়। বীভৎস নীরস পৃথিবীকে সুন্দর করা, পাষাণের বুকে প্রাণ-সঞ্চার করা। ততদিন শুধু, হে পাঁকাল, ক্ষমা নয়, ভালবাসা নয়, কল্পনাও নয়। ততদিন শুধু মহাকবি হাইনের (Heine) স্বপ্ন ও বাসনা :

"Mine is the most peaceable disposition. My wishes are a humble dwelling with a thatched roof, but a good bed, good food, milk and butter of the freshest, flowers at my windows, some fine tall trees before my door ; and if the good God wants to make me completely happy, he will grant me the joy of seeing some six or seven of my enemies hanging from these trees. With my heart full of deep emotions I shall forgive them before they die all the wrong they did me in their lifetime—true, one must forgive one's enemies, but not until they are brought to execution."—Heine.

ইতি—পাঁকাল-বন্দনা সমাপ্ত।

মজুতদার

চিত্তপ্রসাদ

মধ্য-বিত্ত

“আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা’,
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা” ॥

সরকারী সরবরাহ বিভাগে বে-সরকারী বাবু ও বিবি-সরবরাহ শুরু হয়েছে। ট্রামে-বাসে তিল ধারণের জায়গা নেই। না পুরুষ-না-রমণী-অবস্থা যাত্রীদের। কলকাতার বেলা দশটা। বেকারের দল সব সাকার হয়েছে, খাঁদিবুঁচিরাও বাদ যায়নি। বহু নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার খাবি খেতে খেতে বেঁচে উঠেছে। যারা চিরদিনই নিষ্কর্ম্মা, তারা সব আজ বিশ্বকর্ম্মার কারখানায়, ‘অর্ডন্যান্স’ ফ্যাক্টরীতে। ভদ্রসন্তান শ্রমিক হয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জীবন, শ্রমের

চাপে চোয়াল ঠেলে উঠলেও লাগছে মন্দ না। সরবরাহ বিভাগ আর অর্ডন্যান্স ফাক্টরী বাদ দিয়ে যারা অবশিষ্ট থাকে, তারা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে হাওয়াতে ঘুরছে, স্বাধীন হাওয়ায়। কেউ বিমান-ঘাঁটির সাব্-কন্ট্রাক্টর, বাকি সব চোরাবাজারের গোপন মজুতদারের প্রকাশ্য দালাল। কাঠ-কয়লা-আসবাবপত্তর লোহালক্কড়-তার-বল্টু-পাইপ-সুইচ-বাল্ব-ব্লেড্-কাপড়-কাগজ-কুইনাইন্-চাল, নিত্য ব্যবহার্য্য যাবতীয় জিনিসের সর্ব্বময় নির্বিবাদ সদ্ভাব। ঢাল-তলোয়ার না নিয়েই কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকে অবতীর্ণ হয়, তারপর গুরুর কৃপায় ব্লেড্-কাগজ-তার-বল্টুতে হাত পাকিয়ে, কিছু ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে, চেক্ বই পকেটে করে কুইনিন্ ও চালের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। শহরের কাফে হোটেলে, রাস্তার মোড়ে এই দালালদেরই দর্শন মেলে বেশি। দু'দণ্ড বসে এক কাপ চা নিয়ে গালগল্প করার জো নেই। পাশ থেকে, পিছন থেকে অনবরত দরদস্তুর শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে চোরাবাজারের দালাল। চোরা জিনিসের দরদস্তুরের সঙ্গে চল্‌ছে দালালী-পলিটিক্স। জাপানীরা রেডিওয় বলেছে সস্তায় চাল পাওয়া যাবে—মাইরি বল্‌ছি মা-কালীর দিব্যি। আর একজন তার মধ্যে ফোড়ন দিল, মেয়েমানুষও। ভারতের নারীদের যারা বেইজ্জৎ করেছে, তাদের পালা আসছে এবার। ফিরিঙ্গী-মেয়ে বাড়ীর ঝি—আই বাপ্। তিয়েনৎসিনে জাপানীরা তো তাই করেছিল, স্কার্ট খুলে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল রাস্তায়, ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে নাচিয়েছিল। আর একজন বললে, সত্যি বলেছে না কি? জাতীয় স্বাধীনতার দালালী রূপান্তর। হাজার হাজার মণ চালের গুদামে গ্যাঁট হয়ে

বসে আছে আমার স্বদেশবাসী, সেখান থেকে ইংরেজ-বিদ্বেষী স্বদেশপ্রেমের অমৃতবাণী শোনা যাচ্ছে। সদর দরজায় স্বদেশপ্রেমের লাউড্‌স্পীকার। হে দেশবাসী। চাল গুর্খায় খেল, আমেরিকান্‌রা খেল, আর চাল সব আটক রয়ে গেল বর্ম্মায়। সুতরাং গ্রামে চাল ১০০৲ টাকা মণ, শহরে ৪০৲ টাকা। খিড়্‌কির দরজায় সেই ইংরেজের দপ্তরেই আনাগোনা, সেই গোপনে মুনাফালাভের ষড়যন্ত্র ও বকরার হিসেবনিকেশ, কারণ বর্ম্মার চাল নেই, অর্থাৎ বাজারের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নেই, দেশী ব্যবসায়ীর পোয়া-বারো, সে-ই হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। কার সাধ্য তাকে মজুতমালের পর্ব্বতপ্রমাণ গদি থেকে টেনে মাটিতে নামায়। ধন্য দেশপ্রেম। বলিহারি যাই জাতীয়তাবাদের, জাতীয় স্বাধীনতার।

গেল, গেল, গেল, রব উঠেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের কণ্ঠ থেকে। হায়। হায়। মধ্যবিত্ত গেল। সাহিত্যের মজ্‌লিসে, চক্রে, রাজনীতির ড্রয়িংরুমে, আসরে, সভায়, বিরাট বিরাট কেউ-কেটারা বুক চাপ্‌ড়ে হা-হুতাশ করছেন, গেল মধ্যবিত্ত, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এতদিনের সাধের রাজনীতির বনিয়াদ, এতদিনের সাহিত্য-সংস্কৃতির কংক্রীট স্তম্ভ, এবারে বুঝি সমর-সংকটের এক-টনী বোমায় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তিষ্ঠ বৎস। মধ্যবিত্ত যায় নি। কোথায় যাবে ? মধ্যবিত্ত গেলে রাজনীতির সভায় জাতীয়তাবাদের জাঁদরেল বক্তৃতা শুনে ঘন ঘন হাততালি দেবে কে ? মধ্যবিত্ত গেলে বাপের চালের আড়ৎদাড়ির সঙ্গে ছেলের দেশপ্রেম ও রিলিফ ওয়ার্ক একত্রে চালাবে কে ? মধ্যবিত্ত গেলে সদরদরজায় স্বদেশ-প্রেমের সাইনবোর্ড লট্‌কে, খিড়্‌কির দরজা দিয়ে সরকারী সেরেস্তায়

মজুত চালের মুনাফার হিসেবনিকেশ করবে কে? মধ্যবিত্ত গেলে ওয়ার কনট্র্যাক্‌টারীতে গলগণ্ডের মতো ফেঁপে পেট্রলের নিদারুণ অভাবের দিনেও হাম্বারে চড়ে হোটেলে যাবে কে? মধ্যবিত্ত গেলে চোরাবাজারের দালালীর পয়সায় একশ' টাকার 'হোয়াইট্‌ হর্স,' 'জনি ওয়াকার' জলের মতো ঢক্‌ ঢক্‌ ক'রে গিল্‌বে কে, প্রাইভেট্‌ 'Call House'-এ দুঃস্থ, অসহায় নিম্ন মধ্যবিত্তদের পরিবার ধ্বংস করবে কে, তাদের স্ত্রী-কন্যাদের ব্ল্যাক্‌-আউট্‌ রাতে সর্ব্বনাশ করবে কে? মধ্যবিত্ত গেলে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জীবনরক্ষার জন্যে লঙ্গরখানা খুলবে কে, সস্তায় খিঁচুড়ি দেবে কে, জাতির জীবন-মরণ সংকটের দিনে ভেদ-বৈষম্যের বিষ ছড়াবে কে? ...

মধ্যবিত্ত যায়নি। দেশের এই ঘোর সংকটের, এই বিরাট সামাজিক ওলট-পালট, উত্থান-পতনের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি দিলেই পরিষ্কার দেখা যাবে মধ্যবিত্ত যায়নি। মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত যুদ্ধের গঙ্গাজল ছিটেয় রীতিমত চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। যা গিয়েছে তা অতি সামান্য। তাও তারা নিশ্চিহ্ন হযনি, জখম হয়েছে। গিয়েছে স্কুল-মাস্টার, কারণ বছরের পর বছর মাস্টারী করে মগজ খালি হয়ে গিয়েছে, দালালীর বুদ্ধি নেই। আর গিয়েছে বাঁধা স্বল্পবেতনের কেরানী ও চাকুরে বাবুরা। এরা সকলেই জখম বা hard hit, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি, গঙ্গা-যাত্রার অবস্থা থেকে আবার শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছে। বাকি আর কেউ যায়নি। চোরাবাজারের দালাল, ব্যবসায়ী, যুদ্ধের টেক্‌নিসিয়ান্‌, কর্ম্মচারী, কনট্র্যাক্‌টর, কেরানী,—কেউ যায়নি। সবাই ফুলে ফেঁপে কাটবার মতো অবস্থায় পৌঁছেচে। চড়াদামের ব্যবসার বাজার এরাই

চাঙ্গা করে রেখেছে। ফিল্ম ও থিয়েটার ব্যবসায়ীর বাজার এরাই গরম রেখেছে। দোকানে এদের ভিড, হোটেলে এদের ভিড়, চিৎপুর-চৌরঙ্গীতে এদেরই 'কিউ'। যুদ্ধের বাজারে এরা অমর, অক্ষয়, এদের মারবে কে? অতএব মাভৈঃ। মধ্যবিত্ত যায়নি। গ্রামের মহাজন, জোৎদার, শহরের আড়ৎদার, ব্যবসায়ী, দালাল, এদেরই তো পৌষমাস। ··

মধ্যবিত্ত-অট্টালিকার দু-একটা খিলানের চটা উঠেছে মাত্র। বাকিটা ফেরো-কংক্রীট আর ইস্পাত দিয়ে পুনর্গঠিত হ'চ্ছে। মধ্যবিত্ত সমাজের একেবারে তলার দিকটা ভেঙ্গে পড়েছে, বিপর্য্যস্ত হয়েছে। মধ্যের ও উপরের তলা একটার পর একটা তলা গেঁথে ধনিকদের স্কাইস্ক্রেপারের সম-দৈর্ঘ্যে পৌছবার প্রয়াস পাচ্ছে। শুধু তাই নয়। আরও গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত সমাজের কলেবরও বৃদ্ধি হ'চ্ছে। যুদ্ধের আগে যারা শ্রমজীবী ছিল, দিন এনে দিন খেত, তারা আজ ছোট কারখানার মালিক। বিরাট বিরাট লোহা-ইস্পাত অস্ত্রের কারখানার খুদে যোগানদার। নিজেরা হাঁপর টেনে তারা আজ আর হাতুড়ি পেটে না, আজ তারা বড় মিস্ত্রী, মালিক-মিস্ত্রী, বাড়ীতে বসে তারা সাইগন্ রেডিও শোনে, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটর ড্রাইভ্ ক'রে মেট্রোতে যায়। এরকম একজন দু'জন নয়, অনেকে। বিত্তহীন থেকে এরা মধ্যবিত্তের স্তরে একলাফে উঠেছে, তারপর ধাপে ধাপে মইয়ের মাথায় উঠতে চাইছে। সুতরাং মধ্যবিত্তের ভয়ডর নেই। মাভৈঃ মধ্যবিত্ত। বাংলার 'ব্যাঘ্রশাবক' বৃথাই বিলাপ করছেন, বৃথাই মাড়োয়ারী ভাইরা ষণ্ড-শুশ্রূষার জন্যে মাথা না ঘামিয়ে মধ্যবিত্তের রিলিফের জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। মধ্যবিত্ত মরবার নয়। অন্তত যুদ্ধের

সময় তো নয়ই। কারণ মধ্যবিত্তের মস্তিষ্ক, মধ্যবিত্তের শ্রম ও সহযোগিতা না পেলে ধনিকদের যুদ্ধ চলে না। কোনদিনই চলেনি। যতদিন যুদ্ধ ততদিন মধ্যবিত্তের আশা-ভরসা। তারপর অবশ্য একেবারে হতাশ হবার কিছু নেই। আজ যে মধ্যবিত্ত-প্রাসাদ ইট-পাথর দিয়ে ধাপে ধাপে গড়ে তোলা হ'চ্ছে, তার কয়েকটা তলা যুদ্ধের পর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না। যুদ্ধের কলকারখানা, আত্মরক্ষার প্রতিষ্ঠান, যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যবসাবাণিজ্য থেকে যুদ্ধ-দানব যখন লক্ষ লক্ষ চাকুরিজীবী উগ্‌রে দেবে, তখনই আসবে বেকার ও অর্থনৈতিক ঘোর সংকটের সঙ্গে আসল মধ্যবিত্ত-সংকট। বাংলাব ব্যাঘ্রশাবকেরা সেই-দিনের জন্যে প্রস্তুত হ'ন, আজকে স্বশ্রেণীর সমবেদনার পর্দ্দার অন্তরালে চুপিচুপি চোরাবাজারের মুনাফাখোরদের পিঠ থাব্‌ড়ে লাভ নেই, আজকের একতার নিষ্ঠুর সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতার কীলক প্রবেশ করিয়ে আত্মহত্যা ক'রে লাভ নেই। যতদিন যুদ্ধ ততদিন মধ্যবিত্ত বাঁচবেই।…

যারা মরবার মরেছে শুধু তারাই। আজও তারাই মরছে। বাংলার ছয় কোটি লোকের মধ্যে এক কোটি আন্দাজ নিঃস্ব, ভূমিহীন চাষী, আর দেড়কোটি আন্দাজ ভাগচাষী ও গরীব চাষী, জেলে, নাপিত, কাঁসারি, কুমোর; মরেছে এরাই, মরবেও এরাই। মধ্যবিত্ত মরেনি। সমগ্র বাংলার সমাজে যে বৈপ্লবিক বিপর্য্যয় ঘটেছে তা মধ্যবিত্ত সমাজে নয়, নিম্নের এই বিত্তহীন সমাজে। এই বিপর্য্যয়ের প্রতিক্রিয়া আজও তেমনভাবে সমাজে দেখা দেয়নি, মহাসংকটের জগদ্দলের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে। শুধু সমাজ-দেহে নয়, সমাজ-মানসে পর্য্যন্ত যে পরিবর্ত্তন

এই বিপর্যয়ের অনুগামী হবে, তা যেমন বিরাট ও জটিল, তেমনি বৈপ্লবিক। কারণ নিম্নের এই বিত্তহীন সমাজে শুধু ঘর ভাঙেনি, পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, তার সঙ্গে দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে ভেঙেছে চিরদিনের, চিরআদরের সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস—সব।

মধ্য-চিত্ত

চাঁদ্নী রাত। কৌটো থেকে পানের শেষ খিলিটা সদোক্তা মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে ছাতিটা বগলদাবা ক'রে আমাদের পাঁচুদা আফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল পথে। হিসাবে পাঁচ আনার গরমিল, মাগ্গি ভাতার দাবী নামঞ্জুর, হরিদার 'মিলিটারাইজেশন্ স্কীম'-এর গালভরা গল্প, বড়বাবুর ধম্‌কানি—সব মিলিয়ে পাঁচুদার মনটা হয়ে আছে অতি রগডানো পাতিলেবুর মতো তেতো। বিরক্তিতে মুখটা পাঁচের মতো কুচকে পাঁচুদা সিঁড়ি দিয়ে নামছে আর ভাবছে: 'স্কীমটা ভলাণ্টারি হলেও পঁচিশটাকা বেতনবৃদ্ধি, আর তার সঙ্গে মিলিটারী উপাধি 'নায়ক'—এ বড় নেহাৎ কম লোভনীয় নয়। তবে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে যে-কোন জায়গায় চালান যেতে হবে এই যা।" অর্থাৎ সরকারের 'সামরিক পরিকল্পনা'য় পাঁচুদার বেতনবৃদ্ধি হবে মাগ্গিভাতাও মিলবে, তার উপর

নামটা হবে 'নায়ক পাঁচকড়ি দত্ত'। বড়বাবু হবে 'কাপ্তেন'। বণ্ডে প্রায় সকলেই সই করেছে, কয়েকজন মাত্র করেনি, তার মধ্যে পাঁচুদাও একজন। পাঁচুদা বলে, ভাল ক'রে ব্যাপারটা স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করা উচিত, তারও তো একটা মতামত আছে। সামান্য কয়েকটা টাকার লোভে জীবনে সর্ব্বনাশ ডেকে আনা কি উচিত? পাঁচুদা'র তৃতীয়-পক্ষের প্রগতিশীলা সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী দেবীও সেমি-মিলিটারাইজ্‌ড্‌, অর্থাৎ তিনি এ, আর, পি-র ওয়ার্ডেন। ওয়ার্ডেনের ডিউটি দিয়ে সভা-সমিতি ক'রে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আহারান্তে অকাতরে রোজই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েন, বলি বলি ক'রে পাঁচুদার বলা হয় না কথাটা। অথচ গোণা দিন চলে যায়। আজ রাতে কথাটা পাড়তেই হবে।…

ভাবতে ভাবতে পাঁচুদা ট্রাম স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াল। রাত প্রায় এগারোটা। পাশের ফুটপাতে একটা বড় বাড়ীর ঝুল-বারান্দার তলায় একদল লোক চিৎপটাং হয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ঘুমুচ্ছে। দ্বাদশীর চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাদের ধূলিমলিন, প্রায়-উলঙ্গ দেহের উপর। একটা 'পাসিং শো' সিগ্রেট ধরিয়ে ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে সরে দাঁড়াল পাঁচুদা। ব্যাফ্‌ল্‌ওয়ালের পাশ ঘেঁষে বসে কে একজন বিড়ি টানছে। পানের দোকান থেকে আর একজন খৈনি টিপতে টিপতে এগিয়ে এল সেই দিকে। ঘুমন্ত স্ত্রীলোকটির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে খৈনিটা হাতে ঝেড়ে গুঁজে দিল মাড়ির ফাঁকে। স্ত্রীলোকটি অকাতরে ঘুমুচ্ছে হাত পা ছড়িয়ে, সর্ব্বাঙ্গে আবরণ নেই বললেই হয়। কোলের শিশুটি একটি হাত মায়ের রুক্ষ চুলের সঙ্গে জড়িয়ে মাই কামড়ে ধরে বুকের উপর যেন ঝুলে রয়েছে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার লিকলিকে ধড়টা

ধুকছে। লোকটা এইবার পা দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে স্ত্রীলোকটিকে। ব্যাফ্‌ল্‌ওয়ালের পাশ থেকে কাসির শব্দ হ'ল খক্ খক্ ক'রে। স্ত্রীলোকটি ধড়ফড় ক'রে উঠে শিশুটিকে বুকে ক'রে একটা ভাঙ্গা কলাই-করা-থালা নিয়ে চলল লোকটার পিছু পিছু। কোমরের একফালি কাপড়ের উপর ফুট্ ফুট্ করছে জ্যোৎস্না, শীর্ণ শ্রান্ত মুখের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। বাংলার মাতৃমূর্ত্তি! বিশ্বরূপ দর্শনে হতভম্ব হয়ে পাঁচুদা একবার চাঁদের দিকে চেয়ে ভেংচি কাটল। ইচ্ছা হ'ল বলে: "যদি উঠতেই হয় বেহায়ার মতো, তা হ'লে মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকে থাকতে পার নি?" পাঁচুদা এমনিতে ভীতু হলেও, ভাবুক লোক। ট্রামের আশা ছেড়ে দিয়ে পাঁচুদা পদভরসায় গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। এর চেয়ে ব্ল্যাক্-আউট ভাল, শত গুণে ভাল। সভ্যতার এই উলঙ্গ মূর্ত্তি, এই বিকৃত উপদংশ অন্ধকারে ঢেকে রাখাই ভাল! পাঁচুদার মাথায় চিন্তার মজলিস। বড়বাবু কি বাড়ই বেড়েছে! রেশনের চাল মেরে ব্যবসা ক'রে ব্যাটা ফেঁপে গেল, আবার কথায় কথায় লোককে ঘাড়ধাক্কা দেয়! কিচ্ছু টিক্‌বে না বাবা, সব রসাতলে যাবে। একবার বাসুকি ফণাটা নাড়ুক! পাঁচুদা পা চালিয়ে গান ধরল:

"দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হয় ফাক,
বাবা সব হয় ফাক।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক,
বাবা মিছা কর জাঁক।
নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরাপাত্র,
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্।

বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক্,
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হয় ফাক।"

বর্ত্তমানে পাঁচুদার এই হ'ল জীবনদর্শন। কেউ পাঁচুদাকে 'সিনিক' বলেছে, 'পেসিমিস্ট' বলেছে, কিন্তু পাঁচুদা ভ্রূক্ষেপ করেনি। টাকের ওপর ঘাসের চাপড়ার মতো চুলে একবার হাত বুলিয়ে পাঁচুদা তাদের নাকের ডগায় আঙ্গুল নাচিয়ে জবাব দিয়েছেঃ "বাপু হে! বয়স বাড়ুক, চল্লিশের উপরে যাও তখন বুঝবে!" পাঁচুদার থিওরি হ'ল 'Every man after forty is a cynic.' কথাটা বলার ভঙ্গী পাঁচুদার আরও চমৎকার! পাঁচুদা বলে, "কি জান? আদর্শবাদ হ'ল ঐ আঙ্গুর ফল। যৌবনে লাফঝাঁপ দিয়েও যখন তার নাগাল পাওয়া যায় না, তখন এই 'grapes are sour'-সুলভ মনোভাবকেই বলে সিনিসিজ্‌ম্, প্রৌঢ়ত্বে পা দিলে মানুষের যা হতে বাধ্য। পাঁচুদার দর্শন তাই 'দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হয় ফাক!' যাক্ ···

পাঁচুদা হন্ হন্ ক'রে চলেছে। রাত বারোটা বেজে গেল। শর্ট কাট করার ঝোঁকে পাঁচুদা ঢুকে পড়ল এক বাই-লেনের মধ্যে। শুধু দক্ষিণ দিকটা খেয়াল ক'রে একেবেঁকে চলছে পাঁচুদা, অচেনা গলি। হঠাৎ গলির একটা বাঁকে হট্টগোল শুনে পাঁচুদার চিন্তার তকলির সুতো গেল ছিঁড়ে। এগিয়ে গিয়ে ছাতাটা বগলে জোরে চেপে ধরে গলা বাড়িয়ে পাঁচুদা দেখল সার সার লোক লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার কি? রাত দুপুরেও চাল-ডালের ব্যবসা! চোখটা একবার সার্চ লাইটের মতো চারিদিকে ঘুরিয়ে নিল পাঁচুদা। রিক্‌সায় গোরা সৈন্য বসে আছে,

সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিক্সা। হঠাৎ সুতীব্র বামাকণ্ঠ শুনেই উপরে তাকিয়ে দেখল পাঁচুদা, সর্ব্বনাশ! উপরের ঘর থেকে তরঙ্গায়িত তান শোনা যাচ্ছে, "মোর হিয়া কেঁদে মরে!" আর তার সঙ্গে তবলার এলোপাতাড়ি বোল—তাক্-তেরেকেটে-তাক্-গদি-ঘিনে-ধা! পাঁচুদার টাকের ওপর কে যেন চাটি মারল, "এই বেয়াকুফ! ভাগো হিয়াসে!" পাঁচুদা টেনে চম্পট দিয়ে গলির যে-মুখ দিয়ে ঢুকেছিল আবার সেই মুখ দিয়ে সট্ ক'রে বেরিয়ে গেল! বাপরে বাপ! গিলে হজম ক'রে ফেলেছিল আর কি!...

প্রকৃতিস্থ হয়ে পাঁচুদা ভাল ক'রে বুঝল ব্যাপারটা। শ্রীভগবান এখন সর্ব্বভূতে কিউ-রূপে আবির্ভূত হচ্ছেন! এই কিউয়ের কি আর শেষ নেই! এখানেও কিউ! এখানেও আবার race superiority হিসেবে priority! কালে কালে হ'ল কি? বাঙালী শ্রীরাধারাও আজ গোরাকৃষ্ণদের উদ্দেশে কাতর —

"পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে।
কনআ কুম্ভ করি কুচজুগ রাখি
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি।
বেদি বনাওব হম্ আপন অঙ্কমে
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।
কদলি রোপব হাম গুরুয় নিতম্ব
আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প।"

বহুতাচ্ছা দুনিয়া! ভাবোল্লাসে কথাটা বেরিয়ে এল পাঁচুদার মুখ দিয়ে। দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যয় ফাক!...

পাঁচুদার দর্শনই সব জায়গায় ফলে যাচ্ছে। দরদর্ ক'রে ঘামতে ঘামতে পাঁচুদা যখন ঘরে ফিরল তখন রাত প্রায় একটা। ফিরে দেখল ঘর শূন্য, কুমুদিনী দেবী নেই। ভৃত্য বৃন্দাবন দরজা খুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। পাঁচুদা সহজে চটার লোক নয়। বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করল, "গেল কোথায় ?" বৃন্দাবন যা জবাব দিল তাতে আশার কিছু নেই। কে একজন বাবু মোটরে ক'রে এসেছিল, মা রাত্রি নটার সময় তাঁর সঙ্গে বেরিয়েছেন। পাঁচুদা কথাটা শুনে ছাতিটা দু'বার মেঝের উপর ঠুকে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কাকস্য পরিবেদনা। এ-আর-পির ওয়ার্ডেন কয়েকজন মোড়ে পায়চারি করছে বটে, কিন্তু ওরা কি খোঁজ রাখবে ? থানা-পুলিসও একটা হাঙ্গামার ব্যাপার, তার উপর কেলেঙ্কারী ! কোয়ার্টার তিনেক এধার-ওধার ঘুরে ঘুরে ফিরল পাঁচুদা। তাজ্জব ব্যাপার ! কুমুদিনী দেবী ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে retire করেছেন। পাঁচুদা পাঁচের মতো মুখ ক'রে ঢুকতেই তিনি বললেন, "রেড্ সিগ্ন্যাল পড়েছিল, স্টাফ্ অফিসার-এর সঙ্গে কণ্ট্রোল-এ গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ো, রাতে সাইরেন পড়তে পারে !" পাঁচুদার মুখের উত্তর জোগাল না, শুধু বুকটার মধ্যে 'গুঞ্জরিয়া' উঠলো : দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হয় ফাক ! ...

ভাতের গ্রাস মুখে দিতে দিতে পাঁচুদা ডাকল : "বৃন্দাবন !" বৃন্দাবনের নাক ডাকছে। পাঁচুদা আবার ডাকল : "ও বৃন্দাবন !" "বাবু !" ব'লে বৃন্দাবন ঠেলে উঠলো। পাঁচুদা বলল : "শোন্ ! কাল একটা লাল বাতি কিনে এনে আমার ঘরে লাগিয়ে দিবি, বুঝলি ?" বৃন্দাবন ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

নববাবুকথা

"ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনি হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমণীসংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্ধ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্য তৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন ... "

পাঠকবর্গ অনুগ্রহ ক'রে এই ভাষায় ছেদ বসিয়ে পড়বেন, কারণ এ-লেখা বাংলা ভাষার বাল্যকালে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে

শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা ছদ্মনামে শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'গৌড় দেশ চলিত' সাধু ভাষায় বিরচিত। রচনার নাম "নববাবুবিলাস"। উদ্ধৃত করার কারণ আর কিছুই নয়, নবযুগের অর্থাৎ এই 'ইজম'-মুখরিত ইস্পাত-ও-বিদ্যুত-বিনীত, রণতূর্য্যনিনাদিত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী নববাবুদের 'বিলাস' ও 'বিলাপ' বর্ণনা করার আগে তাঁদের চতুর্দ্দশ পুরুষের জীবনেতিহাসের আদিপর্ব্ব জানা উচিত। সেই আদি পর্ব্বের বর্ণনা করেছেন শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা তাঁর ছেদচিহ্নহীন সাধু গৌড়ীয় ভাষায়। ···

নবাবী আমলের সূর্য্য তখন অস্তাচলে। বাংলার পশ্চিমাকাশে মীরজাফর উমিচাঁদ জগৎশেঠের লজ্জারক্তিম মুখচ্ছবি। ঘোর অমানিশার রাত্রি কেটে গেল গৃহ-বিবাদ ও আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের কুৎসিত অভিনয়ে। তারপর "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী রাজদণ্ডরূপে।" যন্ত্রসভ্যতার রূঢ় আঘাতে স্বাবলম্বী গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গেল চুরমার হয়ে। কামার, তাঁতি, ছুতোর, স্যাকরা, পটুয়া, সদাগর, এরাই ছিল আমাদের সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। উপরে রাজা নবাব ও ভূঁঞা আর নীচে সাধারণ কৃষক প্রজাবৃন্দ, এরই মধ্যে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ আর ঘরভরা বধূ নিয়ে কুলুকুলুছন্দে কালাতিপাত করছিলেন বাংলার সেকালের মধ্যবিত্তরা। ইস্পাত ও বাষ্প-বিদ্যুতের দৌলতে ধীরে ধীরে তাঁতির তাঁত গেল, পটুয়ার চাকা গেল, কামারের হাঁপর গেল, আর গেল ধনপতি সদাগরদের বংশধরদের ব্যবসা। আত্মনির্ভরশীল বাংলার গ্রাম পারিপার্শ্বিকের চাপে হ'ল নগরমুখাপেক্ষী। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী গজিয়ে উঠতে লাগলো বণিকরাজ ইংরেজের আওতায়।

ইংরেজের মোসাহেবি ক'রে, ফড়িয়াগিরি ক'রে, দালালি ক'রে, গোটুহেল্-ড্যাম-রাস্কেল ইংরেজী শিখে যাঁরা ইংরেজের শোষণের বিরাট-জটিল শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করলেন তাঁরাই হলেন আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের আদিপুরুষ। তাঁদেরই স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে গঙ্গাতীরে আজও আমরা তর্পণ করি।...

কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'চ্ছে এই যারা "ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো" আর "ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে" আর মনে মনে ভাবে "বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে, চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে" তাদেব কেউ আমাদেব মুমূর্ষু বাংলার সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পায়নি। এমন কি ডিরোজিও-রিচার্ডসনের কাছে শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গলের' দানও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন তাঁরা যাঁরা বাংলার আচারনিষ্ঠ পল্লীগ্রামের শান্ত পরিবেশে প্রতিপালিত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিখেছিলেন অনেক পরে, অথচ বাংলার সামাজিক অগ্রগতির আন্দোলনে তাঁদের সমকক্ষ সেযুগে কেউ ছিল না। দেশের মাটিতে উর্দ্ধাকাশ থেকে বীজ ছড়ালে তাতে সোনার ফসল ফলে না। পতিত ভূঁই, অনুর্ব্বর ভূঁই হলেও হালচষ ক'রে আবাদ করলে, ভাল বীজ ছড়ালে তবেই তাতে সোনা ফলে। অধঃপতিত, কুসংস্কার-কলুষিত সমাজের বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে রামমোহন বিদ্যাসাগর নবীন আগন্তুক সভ্যতার গ্রহণীয় গুণগুলিকে আত্মসাৎ ক'রে দেশের মাটিতে বপন করার আবশ্যকতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বিগত শতাব্দীর বাংলার প্রগতি আন্দোলনে তাঁদের স মকক্ষ আর কেউ ছিল না। ঔপনিবেশিক (Colonial) সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক জাগৃতি-আন্দোলনের ক্রমবিকাশের এই হ'ল বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ক'রে, বাংলাদেশ বা ভারতের মতো উপনিবেশের, যার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একযুগের নয়, বহুযুগের। অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি। বলছিলাম মধ্য-বিত্তের কথা।...

বাঙালীর শুভাকাঙ্ক্ষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'বাঙ্গালী কোথায় গেল?' ব'লে আজীবন আফসোস করেছেন, কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্র থেকে বাঙালীর এই অন্তর্ধানের কারণ নিশ্চয়ই আধিভৌতিক নয়। বাঙালীর এই আত্মবিলুপ্তির (অন্তর্ধানের নয়) কারণ ঐতিহাসিক। ফড়িয়াগিরি ও দালালির মোহে ক্লাইভের স্বদেশবাসীদের পিছু পিছু লেজ নেড়ে ছুটে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চতুর বাঙালী যে সেদিন ঐতিহাসিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি একথা বাংলার কলঙ্কিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কালো কালীতে লেখা আছে। নতন বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের প্রবীণ সমাজ যখন ভেঙে গেল, বাষ্পীয় যানবাহন, যন্ত্রচালিত কল-কারখানা যখন সুতানটি-গোবিন্দপুরে, আদিগঙ্গার ও ভাগীরথীর এ-পারে ও-পারে গড়ে উঠতে লাগলো, চিমনির ধোঁয়ায় যখন নূতন মহানগরীর আকাশ আচ্ছন্ন, তখন বাঙালী ধোঁয়াকালি ও ব্যবসার ধুলোমাটি এড়িয়ে ইংরেজের কেরানী-গিরি, উমেদারী ও মোসায়েবি করেছে, খানা-টেবিলের পাশে ব'সে ইংরেজপ্রভুর উচ্ছিষ্ট রুটির টুকরো আহার করেছে, আর তু-তু ডাক শুনে ছুটে চলেছে সাহেব-সুবোর প্যান্টের বেল্ট ধরে, এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে (আজ এঁরাই "বৃহত্তর বঙ্গ")। এই ফাঁকে বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে দলে দলে লোক এসে দখল করেছে আমাদের যানবাহন, কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য, এমন কি, কাবুল থেকে

কাবুলিওয়ালা এসে হয়েছে এ-দেশের মহাজন। আমরা কেউ করেছি মহা-নগরীতে ইংরেজের কেরানীগিরি ও টাউটের কাজ, আর বাকি সকলে ধ্বংসোন্মুখ গ্রামে গোলাভরা ধানের দিবা-স্বপ্নে বিভোর হয়ে নগরের দিকে পিছন ফিরে বলেছি, "কি সুখেই আছিরে দাদা, কি সুখেই আছি।"

আজ সেই সুখ, সেই আরাম, সেই নীচতা, স্বার্থপরতা ও সমাজ-বিমুখতার পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও মালিন্য সমাজের সঙ্কটের বন্যায় ভেসে উঠেছে। এর আগেও এই ক্লেদ দেখা দিয়েছিল গত মহাযুদ্ধের পর। রাজকীয় নৌবাহিনীতে নাবিক হয়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জমাদার-হাবিলদার হয়ে ফিরেও যুদ্ধজাত অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীর্ণ ঘর, সঙ্কীর্ণ পরিবার ভেঙে পড়েছিল সেদিন। একদল অবসাদ ও অবশ-মনের তাড়নায় স্বজন-পরিবারের কোল থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল নৈরাজ্য-বাদের দ্বীপান্তরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্নচারিতায়; একদল পেটের তাড়নায় শ্রেণী-অভিমান ভুলে গিয়ে জীবিকার্জ্জনের নিম্ন স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিল। একদল আত্মপীড়ন ও ব্যর্থতার হাত থেকে মুক্তি খুঁজেছিল যৌন-পরাধীনতার বিদ্রোহী কাব্যে ও উপন্যাসে। কিন্তু আজ সঙ্কটের রূপই বদলে গিয়েছে। ফ্যাসিজমের সামগ্রিক যন্ত্রযুদ্ধের চাহিদা মেটাতে আজ ডাক পড়েছে এই মধ্য-শ্রেণীর। আজ আবার ব্রেনের প্রয়োজন, শঠতার প্রয়োজন, বিশ্বাসঘাতকতার প্রয়োজন। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগরের আজ চাহিদা বেশী, কেরানী ও কুলি-সর্দ্দারের মূল্যও আজ কম নয়। মহাযুদ্ধ-রূপী দানব আজ তাই আকণ্ঠ উদরসাৎ করছে মধ্যশ্রেণীকে। খুদে ব্যবসাদার-ছুতোর-কামারের আজ পোয়া বারো। ছোট কামারশালা ছ'মাসের লভ্যাংশে মেদস্ফীত হয়ে

আজ কারখানা। ভবঘুরে বেকার আজ সরবরাহের হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত, না-হয় জরুরী যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর কারখানায় শ্রমিক। হয় শ্রমিক না-হয় ধনিক, রাতারাতি মধ্যশ্রেণীর একাংশের এই অবস্থা। আর দালালি বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় বাঙালী আজ আবার তৎপর হয়েছে দালালিতে। ব্ল্যাক-মার্কেটের অলিগলিতে 'ব্ল্যাক-আউট' রাতে তাদের ত্রস্তপদে আনাগোনা। পকেটে কাল ছিল যার ফুটো কড়ি, আজ দালালির কৃপায় তার পকেটে করকরে নোটের বাণ্ডিল। থ্যাঙ্কস্ টু ইন্‌ফ্লেশন! অর্থ ও মুনাফার দৌড় ঝাঁপ কাটাকাটির মধ্যে আজ মধ্যবিত্ত দালাল ভুলে গিয়েছে তার মনুষ্যত্ব, তার স্বাদেশিকতা। আজ যারা মুনাফার লোভে মাটির তলায় বা গোপন গুদামে লুকিয়ে রাখছে হাজার হাজার মণ চাল, ডাল, রোগীর ওষুধপথ্য, দেশবাসীর হাহাকার যারা হোটেলে বসে' অট্টহাস্যে উড়িয়ে দিচ্ছে, কালই তারা মঞ্চের উপরে উঠে দেশপ্রেমের তুবড়ী ছুঁড়ে ধাঁধিয়ে দেবে দেশবাসীকে।

এই হ'ল একদিকের ছবি। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ আজ ধনিক শ্রেণীর নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। থ্যাঙ্কস্ টু দি প্ল্যান অফ সেকেণ্ড ফ্রণ্ট! যুদ্ধ আরও কিছুদিন চললে নাগাল তারা পাবেই। হোক্ না চালের দর দশগুণ, কালীবাড়ী পাঁঠা তারা দেবেই, মসজিদে নমাজ তারা পড়বেই, যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িতা কামনা ক'রে। আর একদিকের ছবি যেমন করুণ তেমনি বীভৎস। হাজার হাজার নিম্নমধ্যবিত্তের ঘর আজ শূন্য। কর্ম্মঠ ছেলে হয় বিমান-ঘাঁটির কুলি, না-হয় কারখানার শ্রমিক। আর অরক্ষণীয়া বয়স্কা মেয়ে হয় উধাও, না-হয় আত্মহত। মন্দিরের দেবতা, মসজিদের আল্লা তাদের কাতরানিতে কর্ণপাত করছে

না। পূর্ব্ববঙ্গের শত শত ঘর আজ হয় জাপানী বোমায় ভস্মীভূত, না-হয় অভাবে অর্দ্ধমৃত। পেটের আগুন আজ মাটির মায়াকে হার মানিয়েছে। রাজার প্রতিনিধিরা মহানগরীর মসনদে ব'সে যখন পরিকল্পনা খস্‌ড়া করছেন, দেশীয় দালাল ও জগৎশেঠের দল তখন নির্ব্বিবাদে মুনাফার হিসেব করছে, আর ওৎপেতে বসে আছে দেশবাসীর গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যে। থ্যাঙ্কস্ টু মিডল-ক্লাস প্যাট্রিয়টিজম্! ···

যুদ্ধের পরের কথা পরেই হবে, এখন ভাবলে গা শিউরে ওঠে। দানব যখন উগ্‌রে দেবে এই মধ্যশ্রেণীর অখাদ্য খাদ্য, তখন জরাজীর্ণ, পাণ্ডুর বাংলাদেশ সেই অসংখ্য বেকারদের ভার সইবে কেমন ক'রে? বেভিন-বালকেরা (Bevin Boys) হয়ত টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হয়ে দেশে ফিরছেন, কিন্তু বালচাঁদ হীরাচাঁদের অনেক শিল্প-পরিকল্পনার ভ্রূণহত্যা হয়েছে। একথা যেন আজকের ইনফ্লেশন ও ব্ল্যাক-মার্কেটের মোহে না ভুলে যাই। ধনিকশ্রেণীর নাগাল যারা পেলেন তাঁদের তো মধ্য থেকে উচ্চ শ্রেণীতে পদোন্নতি হ'ল, তাঁরা বেঁচে গেলেন। এখনই তাঁদের আঙুল ফুলে কলাগাছ, যুদ্ধের পর টাকার দর যখন বাড়বে, জিনিষের দাম যখন হু হু ক'রে কমবে, বাজারের উত্তাপ আসবে জিরোর দিকে নেমে, তখন তাঁদের পেট ফুলে জয়ঢাক হবে। কিন্তু যাঁরা মধ্যিখানেই ঝুলছেন, কোনরকমে হুম্‌ড়ি খেয়ে দেশরক্ষার কোন ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে সঙ্কটের ঢেউ সাঁতরে চলেছেন, তাঁরা যখন আছড়ে পড়বেন তীরে তখন আর তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাবে কি? কিন্তু সে পরের কথা, পরেই হবে। আজ গুপ্ত-কবির ভাষায় এদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করেই শেষ করি:

দালাল

পিসিয়েল্

"হয় দুনিয়া ওলট পালট
আর কিসে ভাই! রক্ষা হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।...
ও ভাই! ততদিন তো খেতে হবে,
যতদিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন করে পেট চালাবো
মোরে গেলাম ভেবে ভেবে।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোড়ে তো নুন জোড়ে না
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটাকাল মাছ খেয়েছে
কেমনে সে শুক্‌নো খাবে?"

কলকেতা-কালচার

"কল্‌কেতা সহর রত্নাকর বিশেষ। এখানে যা না আছে, এমন জানোয়ার পৃথিবীর কোন চিড়িয়াখানায় নাই।" হুতোম একথা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করেছেন। হুতোম প্যাঁচার জন্মের পর একশ' বছর কেটে গিয়েছে, সুতরাং সে-কালের হুতোম আর একালের শ্রীবৎসের নক্সার মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। হুতোমের কল্‌কেতায় কি-ই বা ছিল এমন? এক শতাব্দী পার হয়ে গেলেও গা থেকে তার নবাবী আমলের খোশবায় যায়নি। তখন সবেমাত্র ইংরেজের ভাঁটিখানায় বাবু-চোলাই শুরু হয়েছে, কারণ তা না হ'লে সাম্রাজ্য চালানো যায় না। এই নব্যবাবুরা এক নতুন কাল্‌চার পত্তন করেছিলেন। একদিকে নবাবী আমলের আবর্জ্জনা তরজাখেউড়, আর একদিকে ইংরেজী বণিক সভ্যতার জঞ্জাল, এই ছিল এই নব্য 'বাবু কাল্‌চারের' উপজীব্য।

কথাপ্রসঙ্গে এখানে বলে রাখা উচিত, উনবিংশ শতাব্দীর যে "মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি" জাতীয় নব-জাগৃতির সহায় হয়েছিল, তার সঙ্গে এই 'বাবু-কাল্‌চারের' কোন সম্পর্ক নেই। ভাবধারা ও আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতে যে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই আবর্ত্ত-উৎক্ষিপ্ত ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ্‌-হ'চ্ছে 'বাবু-কাল্‌চার'। কিন্তু এই বাবু-কাল্‌চার একেবারে লোপ পায়নি, যেমন সেই কাল্‌চারের প্রবর্ত্তক 'বাবু শ্রেণী' আজও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। মধ্যে মধ্যে যখন সমাজের বুকে আবর্তের সৃষ্টি হয়, তখনই এই বাবু-কাল্‌চারের বুদ্‌বুদ্‌-উচ্ছ্বাস নজরে পড়ে। এই 'বাবু কাল্‌চারের' টিপিকাল নাম দেওয়া যেতে পারে 'কল্‌কেতা-কাল্‌চার।' এখানে আমরা সেকাল আর একালের এই 'কল্‌কেতা কাল্‌চারের' চুম্বকালোচনা করব। ···

হুতোমের কালেই হুতোম বল্‌ছেন, এখন আর সেকাল নেই। বাঙালী বড় মানুষদের মধ্যে অনেকেই সভ্য হয়েছেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তাভস্মের চুণ দিয়ে পান খাওয়া, কুকুরের বিয়েয় লাখটাকা খরচ করা, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান করতে যাওয়া, শহরে অতি কম হয়ে পড়েছে। শহরে আমদানি হয়েছে চড়কপার্ব্বণ, প্রদর্শনী আর বারোইয়ারি পূজো, ছেলেধরা, মরাফেরা, ভূতনামানো, মহাপুরুষ হঠাৎ-অবতারের হুজুক আর বুজরুকি। সর্ব্বাঙ্গে গয়না, মাথায় জরির টুপি, সিপাই-পেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোচা ক'রে পরা, তারকেশ্বরের ছোপান গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁধা সূতো গলায়, যত ছুতোর, গয়লা, গন্ধবেণে, কাঁসারী চলেছে—"আমাদের বাবুদের বাড়ী

গাজন।” বাবুর প্রপিতামহ হয়ত নিমকের দেওয়ান ছিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছেন। তারপর থেকেই বাবুরা বংশ-পরম্পরায় বনেদী বড়মানুষ। চড়ক গেল, পূজো এল। আফিম গাঁজা মদের সঙ্গে হাফ-আখড়াইয়ের আসরে বাবুদের মৌতাত জমলো। কেউ হয়ত ইয়ারের টেক্কা, কেউ রমণীর কাছে একেবারে চিড়িয়ার গোলাম, কেউ নেশায় ভোলা মহেশ্বরের বাবা। এসব পালপার্ব্বণ ছাড়াও ছিল হুজুক আর বুজরুকি। যেমন, কাবুলি মেওয়াওয়ালারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়। সেখানে মেওয়া খাইয়ে যখন তার দুধে-আলতা রং হয়, তখন তাকে গরম ঘিয়ের কড়ায় চড়িয়ে ভেজে খেয়ে ফেলে; অথবা বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ একবার মরেছিলেন কিন্তু আবার ফিরে এসেছেন, বর্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্যে নালিশ করেছেন, কিম্বা ভূ-কৈলেসের রাজার বাড়ী একজন মহাপুরুষ এসেছেন, গায়ে বড় বড অশথ গাছ ও উইয়ের ঢিপি হয়ে গিয়েছে, চোখ বুজে ধ্যান করছেন, চোখ খুললেই সব ভস্ম ক'রে দেবেন ইত্যাদি নানারকমের হুজুকের আবির্ভাব হত সেকালে শহরে নিত্য নূতন। অথচ, যে-সময়ের কথা বলছি, অর্থাৎ এক শতাব্দী আগেকার কল্‌কেতা শহর, সে-সময় নবাবী বা জমিদারী বিলাসিতার রেওয়াজ প্রায় উঠে গিয়েছে, কারণ হুতোমই বলেছেন যে, গোলাপ জল দিয়ে জলশৌচ আর কুকুরের বিয়েয় লাখটাকা খরচ এসব প্রায় ‘কখনওর’ কোঠায় পড়েছে। সভ্য-শ্রেষ্ঠ ইংরেজ-প্রভুর ফড়িয়াগিরি ক'রে, প্যাণ্ট-কোট পরে মুখে গো-টু-হেল-ড্যাম-রাস্কেল ব'লে যাঁরা ‘বাবু কাল্‌চারে'র বিউগল্ বাজিয়ে ‘বঙ্গরণভূমে’ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই নব্যবাবুদের কাল্‌চার তৈরীর এই সব ছিল মালমশ্‌লা। পরিপার্শ্ব বল্‌তে এককথায় বলা

যায় জব চার্ণকের কল্‌কেতা শহর তখনও আধুনিক অর্থে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর বেশ ধারণ করেনি। সেন্‌ট্রাল এ্যাভিন্যু, রাসবিহারী এ্যাভিন্যু, সাদার্ণ এ্যাভিন্যু, সার্কাস্ এ্যাভিন্যু, গণেশ এ্যাভিন্যু, এসব এ্যাভিন্যু তখন মার্কিনী বা জার্মাণ স্থাপত্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে গড়ে' ওঠেনি, কল্‌কারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় শহরের আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। পুরোদমে ইংরেজ মনিবদের ভাঁটিখানায় বাঙালী বাবুর চোলাই শুরু হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' যদি সাম্রাজ্য সূর্য্যকে পূর্ব্বগগনে স্থির রাখতে হয় তা হ'লে শুধু বাবুদের একটি বংশ চোলাই করলেই চলবে না। মজ্জায় মজ্জায়, শিরায় শিরায় বাবু-কাল্‌চারের বীজাণু সংক্রামিত করতে হবে। জীববিজ্ঞানের "ল" অনুযায়ী যাতে ভবিষ্যতে বাবুদের চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত ইংরেজ-প্রভুর মোসায়েবি করার বৃত্তি বলবৎ থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্ধ দাসত্ব ও নির্ব্বিচার মোসায়েবির ফলে আসলে যে-বৃত্তির বিকাশ হয় সে-বৃত্তি আর ইংরেজসাপেক্ষ থাকে না, যে-কোন প্রভু-মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। **তার সাক্ষী বর্ত্তমানের "বাবু-পলিটিক্স।"**

পলিটিক্স থাক। যা বলছিলাম। এক শতাব্দী আগেকার কল্‌কেতার বাবুদের শিক্ষাদীক্ষা, হালচাল, আচার-সংস্কার ও কাল্‌চারের সঙ্গে আজকের কল্‌কেতার বাবুদের আচার ব্যবহার ও কাল্‌চারের ব্যবধান কতখানি একবার বিচার ক'রে দেখতে কৌতূহল হয় নাকি? হয় বৈ কি। এই বিচার করার সময় এসেছে আজ। সেকালের কল্‌কেতা আর একালের কল্‌কেতায় কত তফাৎ তা টেরিটিবাজার আর টলি-উড, আহিরীটোলা আর আমীর আলি এ্যাভিন্যু, চিৎপুর আর চৌরিঙ্গী পাশাপাশি দেখলেই বোঝা যাবে। কল্‌কেতায় কলাবাগান বস্তি আজও

কলাবৌয়ের মতো ঘোম্‌টা টেনে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িযে আছে, থাক। তবু তো মানুষের স্বপ্নসৌধ কংক্রীট ও ইস্পাতের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে সমুন্নত শিরে কল্‌কেতার বুকে দাঁড়িয়ে আছে আজ? কে তাকে অস্বীকার করবে? শুধু চিমনির ধোঁয়ায় কেন, হুতোমের কাছে যা কল্পনাতীত ছিল, অনাহারে মৃত মানুষের চিতাব ধোঁয়ায়, এ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের গোলার ধোঁয়ায়, বোমার ধোঁযায়, কল্‌কেতার আকাশ কি আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি? সেকালের কল্‌কেতায় দেওযানির ও দালালির অর্থ আর এ-কালের কল্‌কেতায় কালো বাজারের দালালির কাঁচা টাকার সঙ্গে তুলনা হয় কি? একালেব অন্নসত্র ও ফেনদানের কাছে সেকালের পাল-পার্ব্বণের দান, উৎসব ম্লান হয়ে যায় না কি? সেকালের রাজা প্রতাপচাঁদ আর একালের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর সঙ্গে পার্থক্য অনেক। ভূকৈলেসের রাজবাড়ীর মহাপুরুষের সঙ্গে একালের ভূত-ভবিষ্যতের দিব্যদ্রষ্টা সাধু তারকনাথ ও চেতাবনীর তুলনাই হয় না। সেকালের বিবিবিলাস আব একালেব হোটেলে হাফ-গেরস্ত-বিলাসে প্রভেদ অনেকখানি। সবার উপর সেকালের মানুষ, আর একালের মানুষ। একালে একদিকে 'মনির' ইন্‌ফ্লেশন্‌, আর একদিকে 'ম্যানের' ডিফ্লেশন্‌ অতুলনীয়! হুতোম একথা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করেছিলেন: "কল্‌কেতা সহর রত্নাকর বিশেষ। এখানে যা না আছে, এমন জানোয়ার পৃথিবীর কোন চিড়িয়াখানায় নাই।" শ্রীবৎস বলবে, চিড়িয়াখানায় থাকবে কোথা থেকে? চিড়িয়াখানায় যে-সব জানোয়ার থাকে তারা আজ পর্য্যন্ত খাদ্যের জন্যে আর এক জানোয়ারের সামনে 'কিউ' ক'রে দাঁড়ায়নি, 'কিউ' ক'রে শুয়ে থাকেনি

এবং সবার শেষে নিষ্ফল আবেদনে ক্লান্ত হয়ে 'কিউ' ক'রে মরেওনি। ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ার কোন ভোজনবিলাসী জানোয়ারের বদান্যতার মুখচেয়ে ককিয়ে ককিয়ে কেঁদে মরেছে, এমন সৃষ্টিছাড়া ঘটনা জানোয়ারের ইতিহাস কলঙ্কিত করেছে কি কোনদিন ?

'Q'

এক নতুন অর্দ্ধোদয় যোগের অভিজ্ঞতা হ'ল একবার আমাদের, অর্থাৎ আমরা যারা শহরবাসী তাদের। এতদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষদের লাইন দেখেছি কনট্রোল শপের সামনে। দেখতে দেখতে চোখ একরকম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম মনটা বিদ্রোহ করত এই সভ্যতার বিরুদ্ধে। কতদিন ভাবতে ভাবতে রাস্তায় দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে পড়েছি; মনে হয়েছে দিই উড়িয়ে ডিনামাইট দিয়ে এই সভ্যতার উঁইঢিপিটাকে; কিন্তু পরক্ষণেই সিভিকগার্ডের ভয়ে কেঁচো হয়ে গিয়েছি। মনে মনে ভেবেছি, ছি, ছি, কি ছেলেমানুষ আমি। মধ্যে মধ্যে এক একটা কিউয়ের দিকে গাড়োলের মতো হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি, চোখের

'Q'

সূর্য্য রায়
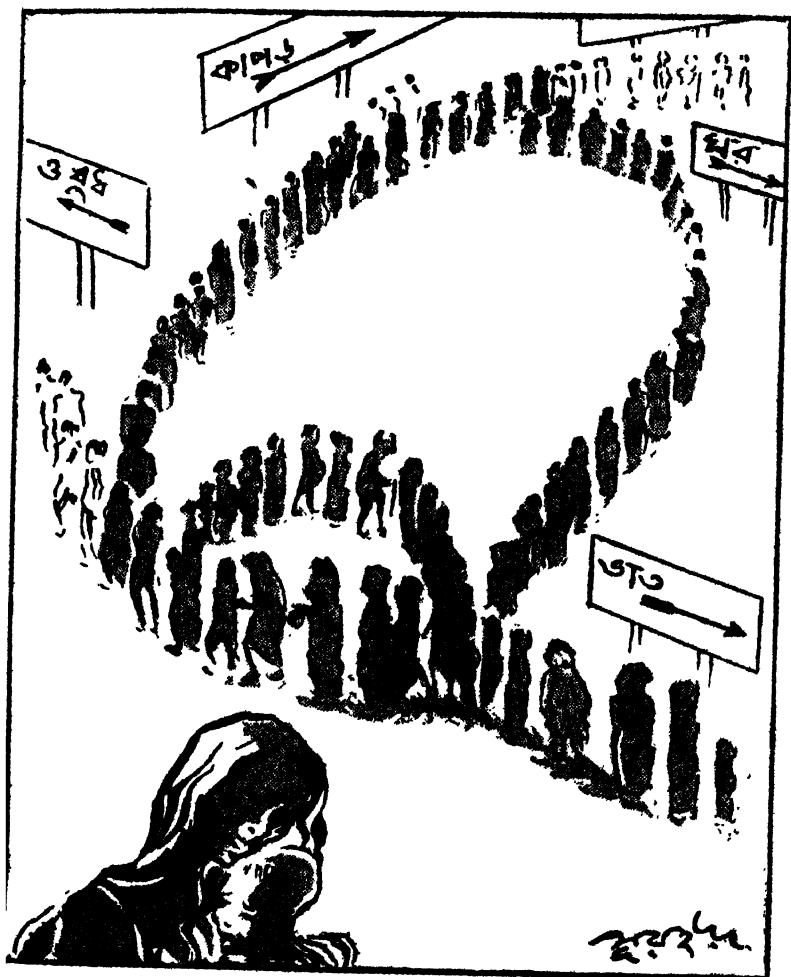
সামনে দেখতে পাই নারীর নারীত্ব চেপটে চাপাটি হয়ে যাচ্ছে। দেখি, শহরের কাছাকাছি-গাঁ-থেকে-আসা ভুখতাড়িত পল্লীবালাদের অর্দ্ধাবৃত দেহের উপর মুকুট-প্রতিনিধিদের বেঁটে বেঁটে ডাণ্ডার চাপ পড়ছে। পেটের জ্বালায় একটু কৃপাদৃষ্টির লোভে তারাও চেষ্টা করছে ঐ গরম লাইনের ভেতর থেকেই টোপ্ ফেলতে। গার্ড কোথাও টোপ্ গিল্‌ছে, কোথাও গিল্‌ছে না, কোথাও বা গার্ডের উপর গুণ্ডারা টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে। এসব একরকম নিত্যদৃশ্য হয়েছে এই সভ্য মহানগরীতে। আর দেখে দেখে চোখ মন দুই-ই হয়েছে গণ্ডারের চামড়া; কিছুই আর বেঁধে না, বাজে না সেখানে। সাইরেনের ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদের মতো ভেতরটা যখন ককিয়ে উঠতে চায় তখন নানারকম বীভৎস মুখ-ভঙ্গিমায় তাকে বোবার মতো প্রকাশ করেই খালাস হই। হাজার হোক, নারায়ণ তো আমাদেরই গৃহদেবতা! গৃহদেবতার মতো আমাদের বুকও আজ শিলায় শিলিত, সব দুঃখ-কষ্টের নিস্তব্ধ গোরস্থান। ...

একবার যে-কোন কারণেই হোক আমাদের মহানগরীতে দু-একদিন জল পাওয়া যায় নি। গায়ে ফোস্কা পড়ার মতো গরম পড়েছে। রাজপথে রিক্সা-ওয়ালার চামড়ার পা গলা গরম পিচের সঙ্গে আটকে যায়। এই অবস্থায় জলের দুর্ভিক্ষ সহজ কথা নয়। দুদিনেই গোটা মহানগরীতে সোরগোল পড়ে গেল, নতুন নতুন দৃশ্য চোখে পড়তে লাগলো পথে ঘাটে। গঙ্গার ঘাটে দু-দশটা চন্দ্রগ্রহণের ভীড়, হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার, শহরের কোনো ট্যাঙ্ক বা পুষ্করিণীতে তিল পরিমাণ ঠাঁই ছিল না। বাঁধানো সিঁড়ির উপর শিশুদের, নারীদের, পুরুষদের পাশাপাশি 'কিউ'—

জলে নামছে, ডুব দিচ্ছে আর উঠছে পানকৌড়ির মতো। তার ওপর স্কোয়ার ঘিরে দর্শকদের ভীড়, কারণ এ জীবন্ত সিনেমা কি-না! আরও চমৎকার ও উপভোগ্য দৃশ্য দেখলাম কর্পোরেশনের জরুরী অবস্থার জন্যে খোড়া টিউবওয়েলে, সিকি মাইল লম্বা কিউ। এই কিউয়ের বৈশিষ্ট্য দেখলাম এই যে, কোন কোন জায়গায় মানুষ নেই, কলের কাছ থেকে বাল্‌তি-ঘড়া-ঘটি-গাড়ু-বদনা-কলসী-কুঁজো-হাড়ি-ড্রাম সার সার চলে গিয়েছে কিউয়ের মতো, মালিকেরা দূরে জটলা করছে। শহরে এতদিন দেখছিলাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের কিউ। নোয়েল কাওয়ার্ডের "Waiting in a queue" কাব্যটির রিফ্রেন আবৃত্তি করতে লাগলাম—

Waiting in a queue
Waiting in a queue
Everybody's always waiting
in a queue.
Fat and thin
They all begin
To take their stand—
it's grand—queueing it.
Everywhere you go
Everywhere you go
Everybody's always standing
in a row.
Short and tall
And one and all
The same as sheep—
just keep—doing it ...

ট্রামে বাসে দেখলাম শহরবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। একজন হ্যাটকোট-পরা ভদ্রলোক মুখের চুরুটের ফাঁক দিয়ে সহযাত্রীদের শুনিয়ে বললেন, "this is town life sir." সকলে সমর্থনের হাসি হাসলেন। অর্থাৎ ভাবটা এই—যেন তাঁরাও ঠিক ঐ কথাটাই ভাবছিলেন, শহুরে জীবনের অসুবিধার কথা। অতএব সিদ্ধান্ত হ'ল শেষ পর্য্যন্ত, 'দাও ফিরে সেই অরণ্য, লও এ নগর।' মনে মনে ভাবলাম, ফিরিয়ে আর দিতে হবে না—বাস করছ অরণ্যেই, নগরে নয়। কথাটা বললে হয়ত হেঁয়ালি শোনাত। তা ছাড়া, প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করত। দরকার কি? বোবার শত্রু নেই, চুপ ক'রে বসে রইলাম। বসে বসে মনে পড়ল আমাদের পাড়ার এক ফক্কর ছোকরার একটি গানের কথা। গানটি বোধ হয় তার নিজেরই রচিত মনোরাজ্যের অফুরন্ত প্রেমিকাদের লক্ষ্য ক'রে। গানটি হ'চ্ছেঃ "টুস্‌কি মেরে পেইলে গেলি, মাইরি মাইরি মাইরি-মাইরি।" গানটি রসোত্তীর্ণ কি-না জানি না, তবে অশ্লীল নয়। ট্রামের সহযাত্রীদের 'সভ্যতা' সম্বন্ধে একই মনোভাবের পরিচয় পেলাম। আধুনিক সভ্যতাকে তাঁরা সকলেই ভালবাসেন, তাকে ভোগ করতে চান কিন্তু চঞ্চলা চটুলা 'সভ্যতা সুন্দরী' যেন 'টুস্‌কি' মেরে তাঁদের কাছে এসেও 'পেইলে' গেল। তাই বল্কলধারী ও অরণ্যচারী হবার বাসনা তাঁদের। ...

ট্রামের কামরা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নয় বা আমার ঘর নয়। তা না হ'লে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা হয়ত দিয়ে ফেলতাম শেষ পর্য্যন্ত। বলতাম, যে-স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ দেখে আপনাদের বল্কলধারী হবার ইচ্ছা হ'চ্ছে, যে-জলাভাব খাদ্যাভাব দেখে আপনাদের অরণ্যচারী হবার বাসনা জাগছে, সেগুলোর

কারণ কি তা কি একবার ভেবে দেখেছেন কেউ ? গোড়ায় গলদ দূর করুন, সভ্যতা-সুন্দরী টুস্‌কি মেরে পালিয়ে যাবে না, প্রেম দেবে, ভালবাসা দেবে, জীবনকে সুন্দর ও মধুর করবে। নগর ছেড়ে গ্রামে যেতে হবে না, গ্রামই নগর হয়ে উঠবে। এ-দোষ সভ্যতা সুন্দরীর নয়, সভ্যতার বর্ত্তমান বিধাতা যারা তাদের। বক্তৃতাটা ভিতরেই সোডার মতো বজবজিয়ে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কাউকে শোনানো হল না।

প্রতিদিন

মানুষের সাহচর্য্য জীবনের একটা মস্তবড় লোভনীয় বস্তু হলেও সব সময় যে লোভনীয় নয়, এ-কথা নিশ্চয়ই আপনার বহু দিন মনে হয়েছে। জীবনের প্রথম প্রেমের সময় প্রেমিকাকে যেমন সুন্দর মনে হয়, অসুখে ভোগার পর প্রথম পথ্যের দিন দূর থেকে গরম ভাতের থালাটিকে যেমন অপূর্ব্ব মনে হয়, জীবনের সব সঙ্গী, বন্ধু, সহকর্ম্মী বা সান্নিধ্যকামী মানুষকে আপনার তেমন মনে হয় না, হতে পারে না। আমি অবশ্য পাওনাদারের কথা বলছি না, কারণ আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে বাড়ীওয়ালা, দুধওয়ালা বা মহাজনের মতো 'centrifugal force' বোধ হয় আর কিছু নেই। যেমন, কোন একটা রাস্তা দিয়ে হয়ত আপনি আপন মনে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা জায়গায় এসে চমকে উঠলেন। তারপর দু-এক পা পিছু হটে, এ্যাবাউট টার্ন ক'রে,

এক মাইল ঘুরে আপনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছলেন। কারণ, সামনেই সেই দোকানটা! আপনি ট্রামে বা বাসে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, সামনে ছুটো সীট আগে দেখলেন সেই পাওনাদার হরিবাবু বসে' রয়েছে। গাড়ী থেকে যে নেমে যাবেন তার কোন উপায় নেই, কারণ বন্ধুবান্ধব আছে। তখন, একবার ভেবে দেখুন, গাড়ীটার মধ্যে, গোটা পৃথিবীর মধ্যে ঐ একটা লোকের অস্তিত্ব আপনার কাছে কি ভীষণ অসহ্য, ভীতিপ্রদ মনে হয়। পথ চলতে চলতে হঠাৎ একটা বুনো জানোয়ারের সামনে পড়লে মানুষ বোধ হয় এমনভাবে আঁৎকে ওঠে না। অথচ লোকটার কোন অপরাধই নেই, নেহাৎ নিরীহ লোক, শুধু হয়ত দেখা হলেই একগাড়ী লোকের মধ্যে দাঁত বার ক'রে বলবে: "নমস্কার কানাইবাবু! অনেকদিন হয়ে গেল, টাকাটার বড় দরকার ছিল। বাড়ীতে আপনার ছু-বার লোক পাঠিয়েছি।" আপনি তখন শশব্যস্ত হয়ে মিথ্যার ফুলঝুরি ছাড়বেন: "অনেক দিন আমি কলকাতায় ছিলাম না। মানে, বাইরে গিয়েছিলাম, অসুখে ভুগলাম। এই তো ছুদিন হ'ল এসেছি। তা যাব'খন একদিন, কখন থাকেন বাসায়? পরশুদিন সকালে যাব।..." ইত্যাদি।

এ তো গেল আপনার পাওনাদার। পাওনাদার ইতিহাসে কখনও দৃষ্টিমধুর ছিল না। কিন্তু আপনার দূর-সম্পর্কের (নিকটও হতে পারে) আত্মীয়? সে তো আর পাওনাদার নয়? আপনার গ্রামে বাড়ী, সম্পর্কে খুড়ো, বয়সে অনেক বড় এবং আপনার বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী। অনেক দিন পর হঠাৎ একদিন ট্রামে দেখা হয়ে গেল খুড়োর সঙ্গে। খুড়ো এক জোড়া জুতো, এক পোট্‌লা কাপড় আর এক ঠোঙা খাবার নিয়ে

রাণাঘাটের লোকাল ধরতে যাচ্ছে। আপনি যাচ্ছেন অফিসে, যুদ্ধের বাজারে স্টীল কনট্রোলের হয়ত ইন্সপেক্টর হয়েছেন আপনি। বেশ কাঁচা টাকা রোজগার করছেন, পরনে স্যুট, একজন অফিসারের 'পোজ' নিয়ে বসে' আছেন। হঠাৎ পিছন থেকে "কি রে হাবু? তুই?" ছোটবেলায় আপনি হাবা ছিলেন, সব সময় হাঁ ক'রে থাকতেন, গাল বেয়ে লালা গড়াত, চোখে পিচুটিসুদ্ধ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকতেন, তাই আপনার আদুরে ডাকনাম হাবু। আজও বাড়ীতে আপনার বুড়ো বাবা, ঠাকুমা ঐ নাম ধরেই ডাকে। সুতরাং খুড়ো আপনার "দীপক" নাম ধরে ডাকতে পারবে না, 'উরুশ্চারণই' হবে না। আপনি ঘড়ি ঘুরিয়ে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে নিশ্চয়ই দু-এক কথা বলে' এড়াতে চাইবেন। যেমন বলবেন, "কেমন আছেন? ভাল তো? সব খবর ভাল?" ইত্যাদি। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী খুড়ো শুভাশুভ সব খবর না দিয়ে ও নিয়ে কেন ছাড়বে? আপনি বসে' আছেন সামনে ডানদিকের রো-তে, খুড়ো বাঁদিকের রো-তে আপনার দুটো সীট পিছনে। ব্যাপারটা হ'ল শুধু শোনা নয়, আপনাকে ঘাড় ঘুরিয়ে শুনতে হ'চ্ছে। তার ওপর অফিস-টাইম, বাদুড়ের মতো লোক ঝুলছে ট্রামে। এর মধ্যে খুড়োর খবরাখবর আরম্ভ হ'ল, "তোমরা তো আর খোঁজ নাও না। তোমার খুড়ীমার বাতের ব্যারাম খুব বেড়েছে। পুকুর থেকে জল আনতে গিয়ে কিছু দিন আগে কল্‌স শুদ্ধু পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছে। বড় বিপদে পড়েছি, তার উপর আবার গর্ভবতী কি না, সেই জন্যে আরও ভয়। কলকাতায় এনেছিলাম। আর গ্রামে, লোকের যা অভাব দুঃখকষ্ট, বুঝলে? দেশের তো খবর নাও না। অমন সম্পত্তিটা তোমাদের

বিক্রী হয়ে গেল। তোমার দাদাদের দিন খুব খারাপ যাচ্ছে, পরনের কাপড়চোপড় নেই, তোমার বৌদি বলব কি, লজ্জায় তো কারও সামনে বেরুতে পারেন না। এবছর ধান হয়নি। দুধ হচ্ছিল, তাও সেই শ্যাম্‌লা গাইটা মরে গেল, কাচ্চা-বাচ্চাগুলোর ভয়ানক কষ্ট …” ইত্যাদি। আপনি তখন প্রায় choked হবার উপক্রম, মানে, একগাদা লোকের সামনে খুড়ো আপনার family history সব গল্‌গল্‌ ক'রে বলে' যাচ্ছে। ট্রামটা না-হয় খুড়োর চণ্ডীমণ্ডপ, কিন্তু আপনার ড্রয়িং রুম তো নয়, তাই আপনি কিছু বলতে কইতে পারছেন না। তারপর একটু দম নিয়ে খুড়ো যখন আবার শুরু করল (তখন আপনি হল্‌ এ্যাণ্ডারসনের দোকান পর্য্যন্ত পৌঁছেচেন) ঃ “হ্যারে হাবু, খাঁদিটার একটু খোঁজ খবর নিস ?” খাঁদি, মানে, আপনার বোন, নিজের বোন। খুড়ো বলছে ঃ “স্বামীটা তো একটা গেঁজেল মাতাল ছিল, হাড়েনাড়ে জ্বালিয়েছে। এখন এক পাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিধবা হ'ল, কে দেখবে বল দিনি ?” আপনার দম বন্ধ হয়, ট্রামটা তখন condemned cell, এবং শুধু সেল নয়, তার মধ্যে যেন choking gas ছাড়া হয়েছে। আপনি এস্‌প্লানেডেই নামলেন, যাবেন ক্লাইভ স্ট্রীটে। এ কি আপনার দুর্ভাগ্য, না সৌভাগ্য ? মনে রাখবেন, খুড়ো কিন্তু আপনার পাওনাদার নয়। এমন একটি খুড়োর সঙ্গে মাঝে মাঝে বাসে ট্রামে দেখা হ'লে কেমন লাগবে আপনার ? …

আপনি 'ক'-বাবুর সঙ্গে বিশেষ এক গুরুতর বিষয় নিয়ে আপনার বৈঠকখানায় বসে' আলাপ করছেন। সেখানে আর কেউ নেই, থাকা উচিতও নয়। পাশে আপনার অন্য একটি বসবার ঘরও রয়েছে, সেখানে বসে' কাগজপত্তরটা উল্‌টিয়ে বেশ খানিকটা সময়ও কাটানো যায়। যখন

আপনি 'ক'-বাবুর সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত, সেই সময় আপনার এক পরিচিত ভদ্রলোক, বেশ বয়স্ক ও শিক্ষিত, ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই বকর-বকর ক'রে তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করলেন। যাঁর সঙ্গে আপনি আলাপ করছিলেন তাঁকে যেন তিনি দেখতেই পাননি এই রকম একটা ভাব মুখে। আপনি দু-একবার আপনার ঔদাসীন্য ও বিরক্তি হাবভাবে ব্যক্ত করলেন, কিন্তু ফল হ'ল না। কেমন লাগে তখন আপনার এই শিক্ষিত ভদ্রলোকটিকে ? এবং বাইরের সেই ভদ্রলোকের কাছেই বা তখন আপনার অবস্থা কি রকম হয় ? সভ্য সমাজে চলেফিরে বেড়াবার মতো সাধারণ বোধশক্তি যার নেই, সেরকম বন্ধু বা সঙ্গী অনেক সময় নানাক্ষেত্রে অসম্ভব পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। এমন কি, কায়মনোবাক্যে আপনি তখন তার বিলুপ্তি কামনা করবেন। করবেন না কি ? ···

এগুলো হ'ল দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কয়েকটা দৃষ্টান্ত মাত্র, আমাদের মতো আত্মসম্মান সচেতন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবনে প্রায়ই যা ঘটে থাকে। এছাড়া আরও মারাত্মক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। মনে করুন, আপনি সেজাতের লোক নন, যারা লক্কা-পায়রার মতো ঘাড় তুলিয়ে বক্-বক্-বকম্-বকম্ করতেই ভালবাসে এবং গাড়োয়ানী রসিকতা ক'রে মনে করে নিজেকে একজন উঁচুদরের রসিক ব্যক্তি। রসিক লোকের সাহচর্য্য পাওয়া সত্যই দুর্লভ। রসিক লোকের সাহচর্য্য যে চায় না, শেক্সপীয়রের সঙ্গীত-বেরসিকের মতো সেও খুন করতে পারে বলা চলে। কিন্তু মনে করুন আপনার কানের পাশে অনর্গল রসিকতার নামে সেকালের তরজাগান হ'চ্ছে এবং আপনার কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্মে সেই গান ছ-সাত ঘণ্টা ধরে' প্রবেশ করছে। এর সঙ্গে

চলছে আধুনিক Sexology, Philology, Criminology থেকে Politics, Economics, Astrophysics-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা। সদাগরী অফিসের একজন সামান্য কেরানী আপনি, সুতরাং অফিস ত্যাগ ক'রে চলে যাবার উপায় নেই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আপনিও কিছু লেখাপড়া শিখেছেন ও করেছেন এবং আলোচ্য বিষয়, তা সে যতই 'nonsense' হোক, আপনার শুনতে হ'চ্ছে। কেমন লাগে এ রকম একটি অবস্থার মধ্যে জীবিকা অর্জ্জন করতে? দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত এই শ্লেষ, বিদ্রূপ, রসিকতা ও আলোচনার বৈদ্যুতিক দীপ্তি, সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি, আপনার চক্ষু-কর্ণকে যে কতদূর পীড়িত করতে পারে তা ভুক্তভোগী না হ'লে বুঝবেন না।

এরকম আরও নানা টাইপের লোক আছেন, যাঁরা জীবনের নানাক্ষেত্রে বন্ধু ও সহকর্ম্মীরূপে এসে আবির্ভূত হন। এই রকম বারোজনকে নিয়েই হয় '**বারোয়ারী**'। এঁদের ব্রেনের grey matter-এ পচন না ধরলে প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো এরকম বিসদৃশ ও অশিষ্ট ব্যবহার না ক'রে নিশ্চয়ই শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষের মতো এঁরা শোভন ও শিষ্ট ব্যবহার করতেন। তবু জানবেন, আপনার কোন ভয় নেই। আপনি যেমন আছেন তেমনি চুপ ক'রেই থাকুন। চারিদিকের অন্যায় ও অবিচার, জঘন্য মোসায়েবি ও ষড়যন্ত্র যদি আপনাকে অপমানিত করতে, অপদার্থ প্রমাণ করতে, দশজনের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে উদ্যত হয়, তা হ'লেও বসে থাকুন চুপ ক'রে, জিত আপনার হবেই। কখনো ক্ষমা করবেন না এদের। "Lord, Forgive them, they know not what they do"—কাপুরুষের উক্তি। আপনার

নীরবতার পিছনে এরকম কোন মনোভাব যেন না থাকে। "Eye for an Eye, Tooth for a Tooth"-ই এ-যুগের একমাত্র ধর্ম্ম। আপনার আপাত নীরবতার পিছনে যেন এই সত্য জীবন্ত থাকে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে। কিন্তু তবু বলছি, কম কথা বলবেন, কম তর্ক করবেন, কম প্রকাশ করবেন নিজেকে। কার্লাইল বলেছেন, "Silence is golden." জানি, কার্লাইল চিররুগ্ন ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর ক্রনিক ডিসপেপসিয়ার জন্যে একথা বলেন নি। আমি আপনাকে কার্লাইল-এর কথায় বলছি, চুপ ক'রে থাকুন, কারণ "Philip will infallibly beat any set of men ... going on raging from shore to shore with all this rampant nonsense ..."

কাক-কয়লা

কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ কবি দেখেছিলেন ময়নাপাড়ার মাঠে এবং কালো তা' সে যতই কালো হোক, তার কালো হরিণ চোখটাই শুধু কবির চোখে পড়েছিল। কয়লা কালো, কয়লা ময়লা এবং কয়লার ময়লা শতবার ধুলেও যায় না। এ-কথা আমরা ইংরেজের কালা-আদমি প্রায়ই বলে' থাকি। অথচ আজকাল পথ চলতে মহানগরীর পথে-হাটে প্রায়ই দেখা যায়, কবি নয়, একেবারে মূর্তিমান গন্তের দল, ময়নাপাড়ার মাঠে নয়, কলকাতার অলিগলিতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু একবারটি বস্তাবোর্থাবন্দী অথবা বাঁশের চটা-বন্দী কয়লা-সুন্দরীর দর্শনের প্রত্যাশায়। দর্শনেই তাদের হৃদয় পুলকিত হয়ে ওঠে, আর স্পর্শে তো রীতিমত রোমাঞ্চ হয়ই। কতদিন দেখেছি কয়লার ডিপোর সামনে কয়লার ঝুঁটি ধরে' টানাটানি, মারামারি,

হাতাহাতি, প্রেমিকাকে নিয়ে প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বীদের চুলোচুলি করার মতো। ইংরেজের কালা-আদমিদেরও যে এমন কয়লার কষ্ট হবে তা কি আর জানতাম! ময়লার এত রূপ, ময়লার এত গুণ, এই কয়লা-সঙ্কটের আগে বোধ হয় এমন ক'রে আর কেউ মর্মে মর্মে বোঝে নি। ...

কয়লার সোহাগের ধুম দেখে মনে হয়, কাকেরও সুদিন আসছে। এতদিন কবিরা কোকিলের সুমধুর কুহু কুহু ডাকের জন্যে কান পেতেছিলেন। কবে বসন্ত আসবে, ঝিরঝিরে সমীরণে শীতের শুক্‌নো ঝরাপাতার খস্‌খসানি আর নতুন পত্রের ঝলমলানির বারতা নিয়ে কবে আসবে কোকিল! ময়নাপাড়ার কালো হরিণ-চোখো কালো মেয়ের মতো কোকিলও কবির কল্পনায় রূপ পেয়েছে, কিন্তু কালো কুজা কয়লার মতো কোন আদর পায়নি শুধু কালো কাক। মহাযুদ্ধকে শতকোটি ধন্যবাদ! অজ কয়লার অভিমান সার্থক হয়েছে। দুয়োরাণী কয়লা আজ মহারাণী। কাকেরও বিরহ-ব্যথা দূর হবার দিন এসেছে। কর্কশ-কণ্ঠ কাক এতদিন আঁস্তাকুড়ের আশেপাশে, উচ্ছিষ্টের উৎস-সন্ধানে ঘুরে বেড়াত, আজ তার এসেছে সোনার সুযোগ। কিন্তু কোথায় কাক? কয়লাসঙ্কটের সঙ্গে দেখা দিয়েছে কাক-সঙ্কট (crow crisis)। শুনেছি গত মহাযুদ্ধের সময় শকুনি বন্দী করার স্কোয়াড বেরিয়েছিল চারিদিকে, যুদ্ধক্ষেত্রে শকুনি ধরে' চালান দেবার জন্যে। এবারও নাকি ঐভাবে শকুনি ধরে' চালান দেওয়া হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করার জন্যে। মানুষের খাদ্যসঙ্কট, কিন্তু শকুনির আজ পোয়া বারো। (আর পোয়া বারো মানবশকুনি মজুতদারের!) আজ যুদ্ধক্ষেত্রে হাটে-মাঠে-গাঁয়ে-রাজপথে

শকুনির আহার্য্যের প্রাচুর্য্য। শহরের রাজপথ থেকে মৃতদেহ স্থানান্তরের যে কঠিন সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তার অনেকখানি সমাধান হ'ত বাইরে থেকে শকুন ধরে' শহরে চালান দিলে। কলকাতায় এমনিতে লোক বেড়েছে যথেষ্ট, সুতরাং হাজার কয়েক শকুনের কি আর স্থান হ'ত না? তা হ'লে কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তারাও রেহাই পেতেন, আর সরকার বাহাদুরকেও বিবৃতি দিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হত না। কিন্তু হায়! শকুনেরও সঙ্কট (crisis of vultures)! শকুন গিয়েছে বর্ম্মায়, মালয়ে, সিঙ্গাপুরে, শকুন গিয়েছে আফ্রিকায়, সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে বিমান-যোগে হয়ত এতদিনে ইটালিতে। কোথায় শকুন, বিপদভঞ্জন মধুসূদন! একবার দেখা দাও, শহরের রাজপথে রাজপথে একবার দেখা দাও, কাউন্সিলার আর মন্ত্রীদের বিবৃতি থেকে বাঁচাও, আর আমাদের বাঁচাও মহামারী থেকে শবের দুর্গন্ধ থেকে, বীভৎসতা থেকে! এ-সভ্যতার 'এঞ্জেল্' তুমি, হে শকুন! ভাগাড় আর বাদাড় থেকে একবার মুক্তপক্ষে আকাশখানা ঢেকে উড়ে এসো জব চার্ণকের মহানগরীতে! ...

তাই বলছিলাম, কাকের শুভদিন আসছে। শকুন নেই, অতএব কাকের কলরব এবার আর কর্কশ লাগবে না। পথ চলতে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার দুর্গন্ধ যখন নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে, কড়কড়ে বাসি মৃতদেহ যখন জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, তখন মনে মনে আমি অন্তত কোকিলকে নয়, কুশ্রী ও কর্কশ কালো কাককেই ভক্তের ভগবানের মতো স্মরণ করি। কলকাতা শহরে কর্পোরেশন কাকের আমদানি করুন, সরকার কাক ধরার জন্যে অফিসার নিয়োগ করুন, তা হ'লে ময়লা ও মৃতদেহ সাফ্ করার সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হবে। কয়লার মতো

কাকের অভাবও নিদারুণ অনুভব করছি, দেখছি সভ্যতার তমোগুণে কালোরই এবার জয় হ'চ্ছে। এদিকেও দেখুন, আলোর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে, কালো অন্ধকার চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। বিষাক্ত কালো সভ্যতা ফণা তুলেছে, তাই আজ কালোর এত আদর। কালো আজ সভ্যতার রাজ, আলো নয়।

বলছিলাম কয়লার কথা, রসিকতাও করিনি, হেঁয়ালিও করিনি, করবার মতো দুঃসাহসও নেই। ঘরে ঘরে আজ খনির আগুন মাথায় উঠেছে, সুতরাং কয়লা নিয়ে ঠাট্টা চলবে না জানি। আসলে আমাদের দেশে কয়লার সমস্যাটা কি রকমের? কয়লা যা এদেশে তোলা হয় খনি থেকে তার অনেকটাই নষ্ট হয় ভাল 'processing'-এর অভাবে। অর্থাৎ কয়লা কাঁচা এবং খনিজ অবস্থায় নানারকম ব্যবহারের জন্যে চালান দেওয়া হয়, তা থেকে শক্ত এবং নরম জ্বালানী কয়লা (hard ও soft coke), আলকাতরা, অ্যামোনিয়াম বা গ্যাস্ তৈরী করার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অভাব। এ ছাড়া coking coal-এর প্রধান ব্যবহার হওয়া উচিত লোহা গলানোর কাজে (iron smelting), কিন্তু তা করা হয় না। ফলে এমনই সঙ্কটের মুখে আমাদের দেশের বর্দ্ধিষ্ণু লোহা ও ইস্পাতের শিল্পবাণিজ্যকে এগিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে যে, কয়লা-বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আগামী ষাট বছরের মধ্যে ভারতের খনিগর্ভস্থ মোট জ্বালানী কয়লা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং লোহা গলানোর জন্যে আর কয়লা মিলবে না। ভারতে প্রচুর খনিজ লোহা মজুত আছে কিন্তু কয়লার অভাবে নাকি ভবিষ্যতে এমন অবস্থা হবে যে এই লোহা বিদেশে চালান দিতে হবে। এটা মোটেই সুলক্ষণ নয়। Coalfields Committee

(1937), Coal Mining Committee (1937), Dr. Fermar, Dr. Fox, Mr. Simpson-প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের কমিটি ও বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, (১) প্রথম কয়লা কাটার সময় এত বেশী কয়লা তোলা হয় যে, খনির ভিতরের ভারস্তম্ভগুলি দুর্ব্বল হয়ে যায় এবং আগুন, জলপ্রবাহ প্রভৃতি নানারকম দুর্ঘটনা ঘটে ; (২) ভালভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা কাটার ব্যবস্থা করা হয় না ; (৩) 'rotational working', অর্থাৎ নীচের 'সীম' (seam) আগে কাটার ফলে উপরের 'সীম'-গুলোর যত্ন নেওয়া হয় না। নীচের সীমের কয়লা ভাল বলে' মালিকেরা মুনাফার লোভে আগে সেই-গুলি কাটেন। উপরের সীমের কয়লা একটু খারাপ হলেও সেগুলোকে বালি ঠেসে (sand-stowing) ভাল ক'রে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয় না, ধ্বসে পড়ে দুর্ঘটনা তো ঘটেই, কয়লারও যথেষ্ট অপচয় হয়। ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা খনিতে এই 'sand-stowing'-এর অভাবে ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া, নানা জায়গায় কয়লার খনি আছে জেনেও সেগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয় না। শুধু তাই নয়, কয়লার খনিতে কয়লা তুলতে তুলতে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার জন্যে বা মুনাফার অংশ সামান্য কমে যাওয়ার জন্যে মালিকরা খনি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র খনি সন্ধানে যাত্রা করেন। ফলে সেই খনিটা অকেজো হয়ে যায়, বহু কয়লা তার তলায় পড়ে থাকে অব্যবহৃত অবস্থায়। যে-সব জমিদার এই সব জমি 'লিজ' দেন, তাঁরাও সে রকম কড়া নিয়ম কিছু করেন না যে, মালিকেরা খনির সদ্ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এই রকম নানাভাবে আমাদের দেশে এত বেশী কয়লা অপচয় হয়ে থাকে যে, আজ পর্য্যন্ত দেশী-বিদেশী প্রত্যেক কয়লা-বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, ভারতকে অদূর ভবিষ্যতে শোচনীয় সঙ্কটের

সম্মুখীন হতে হবে। অদূর ভবিষ্যৎ যে বেশী দূরে নয় তা আজই আমরা মনেপ্রাণে বুঝতে পারছি। …

যুদ্ধের সময় এমনিতেই কয়লার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। অতিরিক্ত কল-কারখানায় কত চুল্লী যে অহরহ জ্বলছে আর রাক্ষসের মতো কয়লা গিল্‌ছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই দিকে নজর রেখে উচিত ছিল কয়লা উৎপাদন বাড়ানো। কিন্তু উৎপাদন বাড়েনি। কয়লা উৎপাদনের যে 'Index' কিছুদিন আগে 'Capital' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায়, ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ছিল ১২৩, আর ১৯৪৩ সালেব ফেব্রুয়ারীতে হয়েছে কমে ১১৫। এদিকে যুদ্ধসামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে কয়লার চাহিদা বেড়েছে অনেক। সুতরাং সঙ্কট আর কতদিন লুকিয়ে থাকবে? তারপর শুধু ওয়াগনের অভাব নয়, শিল্প-পরিকল্পনার শোচনীয় অব্যবস্থার জন্যে কয়লা এক শিল্পকেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে চালান দিতে মালগাড়ীর ইঞ্জিন যে কি পরিমাণ কয়লা পোড়ায় তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। এর কি কোন উপায় আছে? …

সমাধানের নির্দেশ অবশ্য ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি দিয়েছিলেন। প্ল্যানিং কমিটির প্রস্তাব হ'চ্ছে: "We consider that in the interests of the nation it is imperative that coal mines and the coal mining industry ... should be completely nationalised." অর্থাৎ রাষ্ট্রের উচিত কয়লা উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া। কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রীকরণের (Nationalisation) যে প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিটি দিয়েছেন তা একশ'বার সমর্থনযোগ্য,

কিন্তু কে সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করবে? রাষ্ট্র? সরকার? খনিমালিক? ...

জ্যোৎস্নালোকিত যামিনীতে মহানগরীর রাজপথে আমি তাই ধ্যাননিবিষ্টচিত্তে আজ স্মরণ করি কাক ও কয়লাকে, কারণ কয়লা তা সে যতই ময়লা হো'ক, এ-যুগের কবির কাছে সে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ। মনে মনে বলি:

হায় কয়লা! তুমি কি শুধু কয়লা?
ঐ যে মেয়েটি ময়লা
ঐ যারা করে আছে ভিড়
নগরীর নীড়
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?
তুমি শুধু কয়লা, হায় কয়লা?

ধূমাবতী — সূর্য্য রায়

২

হাস্যকৌতুক ও কিউ

হোস্ পাইপ নয়, কংক্রীটের হিউম পাইপও নয়, রীতিমত রক্তমাংসের 'হিউম্যান' পাইপ। স্পিটফায়ারে ব্যোম থেকে দেখলে মনে হবে মানুষের পাইপ-লাইন। ডোবার মধ্যে বসে' দেখলে মনে হবে মানুষের চিমনি। ক্যাম্বিস্ নয়, কংক্রীট নয়, ইস্পাত নয়—মানুষ। চৈত্রের চামড়া-পোড়া রোদে এরকম পাইপ আজকাল চারিদিকে দেখি মহানগরীর রাজপথে, অলিগলিতে। কখন দেখি জেলেপাড়ার মুদির দোকানে, কখন চিৎপুরের কান্তার আড়তে, সিনেমার কাউন্টারে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, কখন কলেজ স্কোয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শ্রীশ্রীচেতাবনীর চেলাদের হস্তরেখার ছকের চারিদিকে। মণিপুরের ওদিক থেকে আসছে বিরাটকায় কল্‌কি অবতার, রথিডং-এর দিক থেকে খর্ব্বকায় জাপানী স্থলদস্যু। সভয়ে স্মরণ করি শ্রীশ্রীচেতাবনীকে আর মিস্টার উইনস্টন চার্চিলকে। ...

সেদিন চার্চিল ও চেতাবনীর শতনাম জপতে জপতে ঘরের দিকে ফিরছি, পথে দেখলাম এই রকম এক জ্যান্ত পাইপের সামনে ছোটখাট একটি জনসভার দৃশ্য। ব্যাপারটা আর কিছু নয়—একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক পাইপের তাতে বেহুস হয়ে পড়েছে আর একজন প্রায় ঘণ্টা

তিনেক ধরে' শামুকের মতো এগিয়ে দোকানীর হাত বরাবর পৌঁছে দৈবাৎ পিছলে গিয়েছে পাইপের গা থেকে। কংক্রীট ইস্পাতের পাইপ তাতে আগুন হয়, পিচের রাজপথ গলে যায়, মানুষের পাইপও ঘেমে হড়হড়ে হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকটির দোষ নেই। স্বস্থানে প্রবেশাধিকার চাচ্ছে, পাচ্ছে না। পিছনের 'বনটিয়া' সখি আঙ্গুল দেখিয়ে দিচ্ছে প্রায় দু'শ গজ লম্বা পাইপের পুচ্ছপ্রান্ত। ফলে স্ত্রীলোকটির মূর্তি হয়েছে শ্মশানকালীর মতো—করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং। পাইপের পুচ্ছপ্রান্তে দাঁড়িয়ে 'পুচ্ছটি-তোর-উচ্চে-তুলে-নাচা'-মার্কা জন-কয়েক মধ্যবিত্ত 'সবুজ' খিল্ খিল্ ক'রে হাসছে। কারণ বোধ হয় ঘটনার উদ্ভটত্ব। একবার শুধু বিদ্যুতের মতো মনে হ'ল, হুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ি ওদের ঘাড়ের উপর। হাঁচড়ে গায়ের ছাল তুলে নিই। কেন হ'ল জানি না, বোধ হয় রক্তের দোষ। কিন্তু লেজ যখন অনেক কষ্টে একবার খসিয়েছি তখন আবার প্রাগৈতি-হাসিক যুগে ফিরে যেতে লজ্জা হ'ল। প্রতিক্রিয়ার উত্তাপ দ্রুত প্রায় ফ্রিজিং পয়েণ্টে নেমে এল। করুণ রস, বীভৎস রস ও হাস্যরসের ত্রিবেণী-সঙ্গমে মন তখন আমার আরামে চিৎসাঁতার কাটছে।...

মাথা তো আর মাথা নয়—ভিমরুলের চাক্। ভোঁ ক'রে বেরিয়ে এল চিন্তার ভিমরুল ঝাঁকে ঝাঁকে। সেই হাসির খোঁচা। ভাবছিলাম কারা ওরা, এমন টন্‌টনে রসজ্ঞান। ব্ল্যাক্-মার্কেটের কাঁচাপাকা মালের দালাল অথবা শিল্পী। হয় সুপার-ব্রোকার, না হয় স্যাটারিস্ট। কিন্তু বাবুদের মুখের উপর খোসামুদে বয়স্তের ছাপই স্পষ্ট, শিল্পীর সৌম্যভাব নেই। যে দেশের লোক হাসতে ভুলে গিয়েছে সে-দেশে এমনি বয়স্তের হাসিই চোখে পড়ে বেশী। এদেশের ভুড়িওয়ালা ভুইঞাদের মেজাজ খুশ রাখার জন্যে যে

হাফ-আখড়াই ও তরজার সৃষ্টি হয়েছিল একদিন, আজ তাই ফিরে আসছে আবার বিংশ শতাব্দীর ফুলবাবু ও হাফ-বাবুদের দৌলতে। ...

যে-দেশের লোক হাসতে ও হাসাতে পারে না, বুঝতে হবে তার প্রাণশক্তি লোপ পেয়েছে। যে হাসে এবং হাসাতে পারে সে-ই তো মানুষ। দার্শনিক বার্গসন্ তাই মানুষকে বলেছেন, "an animal which laughs and is laughed at." সত্যিই তো, হাসি বাদ দিলে তো মানুষের সংস্কৃতির ভাণ্ডার অর্দ্ধেক খালি হয়ে যায়। সংস্কৃতির আর্য্যরসিকরা হয়ত বলবেন 'বিশুদ্ধ হাসি'র কথা, কিন্তু 'বিশুদ্ধ হাসি' মাঝে মাঝে পথে ঘাটে নজরে পড়ে, কেউ রাস্তার কলের জলে ফুঁ দিয়ে, কেউ বা ট্র্যাফিকের মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো দাঁড়িয়ে 'বিশুদ্ধ হাসি' হাসছে। কিন্তু সে-হাসি দেশে যত কম দেখেন ততই মঙ্গল। হাসি সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হ'ল, হাসি সামাজিক। সমাজের ভিতরকার বিরোধ থেকে হাসির ফোয়ারা ছোটে। ভাল হাসি হাসতে হ'লে সমাজের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হবে, সমাজ-সচেতন হতে হবে। তা না হ'লে হবে রাজা হাসল, পারিষদ হাসল। যিনি হাসবেন তাঁর দায়িত্ব কম নয়। হাসি, শ্লেষ, বিদ্রূপ হবে উদ্দেশ্য-প্রধান, আর যিনি হাসবেন তাঁর উদ্দেশ্য হবে ক্ল্যাসিক কমিডিয়ানের যা উদ্দেশ্য তাই—'to chasten morals with ridicule ?'

তাই বলে' হিউমারিস্ট বা স্যাটারিস্ট গুরুমশাই নন, আর্টিস্ট। সোজাসুজি কান ধরে ঠাস্ ক'রে চড় মারলে স্যাটারিস্টের চলবে না। হাত ধরে' নিয়ে এসে তাঁর নায়ক নায়িকাদের দাঁড় করাতে হবে সমাজের মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে। তারপর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাদের মুখোস্

এমনভাবে খুলতে হবে যাতে তাদের সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণু 'shame! shame!' বলে' চেঁচিয়ে ওঠে। নাট্যশালার অডিটোরিয়াম থেকে বাইরের বৃহত্তর সমাজের অডিটোরিয়াম পর্য্যন্ত পাঠক, দর্শক, শ্রোতাদের মধ্যে গায়ে যার বিঁধবে সে-ই বুঝবে। শিল্পীর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি বলবেন : "If I sometimes make you feel like a fool, remember that I have by the same action cured your folly, just as the dentist cures your toothache by pulling out your tooth. And I never do it without giving you plenty of laughing gas." — Bernard Shaw. আমি বলি, লাফিং-গ্যাসের সঙ্গে কিছু টিয়ার গ্যাস্‌ও ছাড়া ভাল। ...

এক সময় আমাদের দেশের কবিরা আমাদের শুনিয়েছেন স্ত্রীর পতিনিন্দা, সতীনের ঝগড়া। তারপর ইংরেজ প্রভুদের সংস্পর্শে এসে সমাজে যে নতুন ভাবধারা, নতুন আচার-ব্যবহার চালু হ'ল, নতুন ও পুরাতনের সংঘাতে যে ভাব-বিরোধ ও আচার-বৈষম্য দেখা দিল, তার ফলে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু, ঈশ্বর গুপ্ত,—হাস্যরসে ও ব্যঙ্গরসে আমাদের সাহিত্যের বহুদিনের অভাব এঁরা মিটিয়ে দিলেন অনেকখানি। বাংলার হাফ-আখড়াই, খেমটা-তরজার প্রভাব থেকে এঁরা একেবারে মুক্তি পাননি সত্যি, কিন্তু এঁরাই বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ব্যঙ্গ রচনার স্রষ্টা। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, পাঁচকড়ি, বীরবল, কেদারনাথ, পরশুরাম, দিবাকর শর্ম্মা, সজনীকান্ত দাস, বনফুল এবং আরও অনেকে। ক্রমে ক্রমে এঁদের মধ্যে অনেকেরই কলমের ধার কমে এল। হাসি

'সুড়সুড়িতে' এবং ব্যঙ্গ রঙ্গে পরিণত হ'ল। তার কারণ, আজ আমাদের সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধ এত তীব্র হয়েছে যে, এঁদের শক্তিতে হাল ধরে থাকা আর সম্ভব হ'চ্ছে না। তাই পরস্পর-বিরোধী নানারকম আদর্শ ও ঘটনার আবর্তে যখন সমাজের বুকে ভয়ানক তোলপাড় শুরু হয়েছে ঠিক তখনই এঁরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, ভিড় দেখে পথের পাশে গা-ঢাকা দিচ্ছেন। ...

নতুন লেখকদের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি। 'রাজবন্দী' লেখকদের দু-একজনের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। মালমশলার ভাণ্ডার যখন ভর্তি তখন শুধু অক্ষম ও উদ্ভট কাব্য লিখে আমরা নিজেদেরই ব্যঙ্গ করছি। তা না হ'লে সেদিন ঐ বাবুদের হাসি দেখে আজও চুপ ক'রে বসে থাকি? ঊনবিংশ শতাব্দীর 'বাবু' আজ চেম্বারলেন ও চার্চিলের সাঁড়াশীর মধ্যে বন্দী। আমার মাথায় এর বেশী আর কিছু এল না। মাথা তখন সোঁ সোঁ করছে, কানে ভোঁ ভোঁ বাজছে, পেট কোঁ কোঁ করছে। একখানা রামপ্রসাদী গুন্ গুন্ করতে করতে বাড়ী ফিরলাম শেষ পর্যন্ত—

এবার কালী তোমায় খাব—
গণ্ডযোগে জন্ম নিলে সে হয় যে
মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দু'টার একটা ক'রে যাব,
এবার কালী তোমায় খাব।

ক্রমবিকাশ ও কিউ

'হুপ' ক'রে লাফিয়ে পড়ে রসিকচূড়ামণি হাফ-বাবুদের হাচড়ে গায়ের ছাল তুলে নিতে ইচ্ছে হয়েছিল—এ-কথা আগে বলেছি, তাতে কেউ বলতে পারেন, এমন জাম্বুবানের প্রবৃত্তি আমাকে হঠাৎ পেয়ে বসেছিল কেন? এঁদের অতি-চেতন 'মনুষ্যশ্রেণীবোধকে' আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও আবার স্বীকার করছি যে, মাঝে মাঝে এই ভদ্রসমাজে চলে ফিরে বেড়াবার সময় আমার প্রায়ই ইচ্ছে করে জৈবিক ক্রমবিকাশের কয়েক ধাপ নেমে এসে জাম্বুবান বা দানব হই। ছোটবেলা বাপ-মায়ের শাসন মানিনি, ঘরছাড়া ক'রে দেওয়ার বহু আগে নিজেকেই ঘরছাড়া হতে হয়েছে। কারণ তাঁদের উপহার দেওয়া ঠুলি কলুর বলদের মতো চোখে পরতে পারিনি। তা-হ'লে হয়ত এতদিন হতচ্ছাড়ার মতো জীবন না কাটিয়ে ঠুলির ভেতর

দিয়ে গরুর মতো করুণ দৃষ্টিতে বাইরের পৃথিবীর দিকে চেয়ে আপনাদের এই সমাজের ঘানি ঘর্ঘর ক'রে ঘুরিয়ে যেতাম। তা যখন পারিনি করতে তখন আর চোখ বুঁজে থাকার ফুরসৎ কোথায়? ইচ্ছেটা আমার সুস্থ নয় জানি; কিন্তু সমাজেব সর্বাঙ্গ যখন উপদংশে ক্ষতবিক্ষত তখন টম্যাটোর মতো সুস্থ দেহ আর কচ্ছপের মতো সুস্থ মন নিয়ে সমাজে বাস করা চলে কি? অনেকে বলবেন, 'নিউরসিস'। মানি — 'নিউরসিস', কিন্তু 'নিউরসিসই' যে এই সমাজেব 'নেমেসিস'। সমাজের বুকে আগুনের ফুল্‌কি হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে, আব আমরা তার মধ্যে বাস কবছি, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি বারুদের মতো মন নিয়ে। 'বার্স্ট' একদিন করতেই হবে, তা সে ঘরেব বৌ-এর বিরুদ্ধেই হোক, আব সমাজপতি রাষ্ট্রপতিদের বিরুদ্ধেই হোক। এমনি 'বার্স্ট' করার মুহূর্ত্ত কত না আসে প্রত্যেকদিন, যেমন এসেছিল আমার সেদিন ঐ 'কিউ'-এর সামনে। ...

গুন্ গুন্ করতে করতে সেদিন রাতে ঘরে ফিরে দেখি স্ত্রী আমার গরম তেলের মতো টগ্‌বগ করছেন। আর যাবি কোথা! শুক্‌নো লঙ্কা, অর্থাৎ আমি হাজির হতেই যা হবার এবং যা বলার নয় তাই হ'ল। নিভন্ত উনুনের উপর ধ্যানমগ্ন ভাতের হাঁড়িটাকে দেখে করুণা হ'ল, ভয়ও হ'ল। তাড়াতাড়ি ফিরে মাসকাবারের জিনিষপত্তর এনে দেবার কথা ছিল আমার, স্রেফ ভুলে গিয়েছি। ঢক্ ঢক্ ক'রে দু গ্লাস জল খেয়ে পেটে দুটো পালোয়ানী থাবা মেরে শুয়ে পড়লাম পাটির উপর। স্ত্রীকে বললাম "শতকরা ৯০ জনের মধ্যে আমরা মাত্র দু'জন। ম্যাট্রিকে তো তোমার ম্যাথামেটিক্‌স ছিল, জানো পার্সেণ্টেজ কষলে ডেসিমেল্ পয়েণ্টের পর কতগুলো শূন্য পড়বে? সুতরাং, দুঃখ কিসের?" স্ত্রীটির

স্বভাবও ঠিক খড়ের আগুনের মতো, যেমন দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে তেমনি খপ্ ক'রে নিভে যায়। এর মধ্যেই মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। হাসতে হাসতে আমাকে তিনি শুনিয়ে গেলেন, "পাশের ফ্ল্যাটে ওদের রান্নার পর উনুন খালি হ'লে বেঁধে নেব।" "বহুতাচ্ছা" বলে' আমি আমার ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাট্ হয়ে শুয়ে রইলাম। মাথার মধ্যে ভীমরুলগুলোর ভোঁ তখন রীতিমত 'সিমফনি'তে পরিণত হয়েছে। চোখের সামনে, মাথার মধ্যে, দেয়ালের গায়ে, কড়িকাঠে, এমন কি, স্ত্রীর মুখের উপর পর্যন্ত সেই 'কন্‌ট্রোল শপের' সামনের লম্বা 'কিউ'টা বারবার 'ফেড-ইন' আর 'ফেড-আউট্' করছে। অচেনা মূর্তির মিছিল। দড়ির এক প্রান্তে 'কন্‌ট্রোল শপ' আর এক প্রান্তে আদিম শূন্য —"vast multitude of stars are wandering about in space." একদিকে টাটার হাজার ফার্নেসের উত্তাপ নিয়ে অসংখ্য ঘূর্ণায়মান গ্রহনক্ষত্র, আর এক দিকে 'কন্‌ট্রোল শপের' সামনে দোকানদারের হাতে একঠোঙা চাল। উত্তাপ ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে দেখলাম—জন্ম নিল জীবন (Life), এই পৃথিবী। তার পরে কত পরে জীবজন্তু, মানুষ আর মানুষের এই সভ্যতা। হায়রে মানুষ! হায়রে সভ্যতা! এরই জন্যে এত বড়াই! ভুলে যেও না পদার্থবিদদের "Second Law of Thermodynamics"— দম্-দেওয়া ঘড়ির মতো ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্শক্তি (energy) ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, একদিন ঘড়ির মতোই ব্রহ্মাণ্ড একেবারে স্থির হয়ে যাবে, গতির কোন চিহ্ন থাকবে না। তখন? ...

তখন আর কি? আমরা সবাই হয়ে যাব রেফ্রিজারেটারের দই, না-হয় আইসক্রীম সন্দেশ। রাবিশ! আরে, ঘাব্‌ড়াবার কি আছে? ঠাণ্ডা

হলেই হ'ল নাকি? আসলে থার্মোডাইনামিক্‌সের সেকেণ্ড ল'-টা যখন পদার্থবিদ্‌দের মাথায় এসেছিল, তখন সমাজের অবস্থাটা কি? বাণিজ্য-বিপ্লবের (Industrial Revolution) পর সমাজে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সংঘাত এত তীব্র হয়েছিল, 'Natural Selection' এমনভাবে হাঁটু গেড়ে বসেছিল বৈজ্ঞানিকদের ও দার্শনিকদের মনে যে, পৃথিবীতে আবাব যে কোনদিন শান্তি আসবে তা কেউ কল্পনা করতেও পাবে নি। ফলে সবক্ষেত্রেই, সাহিত্যে ও শিল্পকলায়, নৈরাশ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ ফুটে উঠেছিল এবং বৈজ্ঞানিকদেরও মাথায় এসেছিল ঐ থার্মোডাইনামিক্‌সেব সেকেণ্ড ল'। অতএব মাভৈঃ। মানুষ ও জগৎ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে তেমনি এগিয়ে যাবেই—মাঝে মাঝে আছাড় খেতেই হবে, ফ্র্যাক্‌চাবও হবে। তাতে কি ভয় পেলে চলে? ···

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, জৈবিক ক্রম-বিকাশের কাল হ'চ্ছে প্রায় এক শ' কোটি বছর। এখন আমার ঐ দু শ' গজ লম্বা 'কিউ' বা 'দড়ি'টাকে যদি এই এক শ' কোটি বছরের একটা 'tape' ধরে নিই, কিউয়েব প্রত্যেক গজ পঞ্চাশ লক্ষ বছর, তা হ'লে 'কিউ' টাই হবে জৈবিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস। 'কিউ'যের শেষে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাসার সামনের কয়লাওয়ালার সহধর্ম্মিণী। ওকে আমি চিনি, ওর নাম রুক্মিণী। আধা-পাগলী রুক্মিণী থেকেই কিন্তু 'জীবনের' শুরু। এক ইঞ্চি কিউয়ের মধ্যে প্রায় চার হাজার জেনারেশনের আয়ু শেষ হ'চ্ছে। অর্দ্ধাহার ও অনাহারে থেকেও রুক্মিণীর দেহেব স্থূলতা এখনও যতখানি আছে, তাতে রুক্মিণীর দেহের প্রস্থ পার হতে কত জেনারেশন যে জন্মাচ্ছে মরছে তার ঠিক নেই। 'কিউ'টা রুক্মিণীর কাছ থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা এসে শেষের দিকে একটু বেঁকে

দুটো 'ব্যাফল্ ওয়ালের' মধ্যে দিয়ে দোকানের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। কোন জীব-বৈজ্ঞানিক (সিভিক্ গার্ড নয়) যদি রুক্মিণীর কাছ থেকে 'কিউ' পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে কন্‌ট্রোলের কাউণ্টার পর্য্যন্ত যান তা হলেই তিনি জীবজগতের আগাগোড়া ইতিহাস বলে' দিতে পারেন। এখন দেখা যাক্ আমাদের বৈজ্ঞানিক মশাই কি দেখছেন ? ...

রুক্মিণী, জগত্তারিণী, হরিদাসী, হাবার মা, মান্‌কের পিসি, এমনি ক'রে একে একে সব চলে যায়। বাঁকের কাছ থেকে কণ্ট্রোলের দোকানদারেব গোল গোল চোখ আর লোমশ হাত দেখা যায়, অথচ জীবজন্তু বা চতুষ্পদ জন্তু পর্য্যন্ত কিছুই দেখা যায় না, দ্বিপদ মানুষ তো দূরের কথা। প্রায় 'ব্যাফল্ ওয়ালের' কাছ বরাবর পৌঁছলে তবে সর্ব্বপ্রথম নজরে পড়ে পালকওয়ালা জীব অর্থাৎ মামাল্ ও পাখি। তখনও ডাইনোসার আর সরীসৃপজাতীয় জীব হেঁটে যাচ্ছে কিউয়ের ধার দিয়ে। 'ব্যাফল্ ওয়ালের' মধ্যে আধ-চ্যাপ্টা গণেশের ঠাকুমা-বুড়ীর কাছে গেলে দেখা যায় বানর। দোকানের প্রায় আধ-গজ দূরে, যেখান থেকে খেঁদীর দিদিমা দোকানীর বাপান্ত করতে করতে হাত বাড়াচ্ছে, সেখানেই দেখা যায় বিখ্যাত 'missing link' পিথিক্যানথ্রোপাস্ (PITHECANTHROPUS) — অৰ্দ্ধেক-বানর তার অৰ্দ্ধেক-মানব। কাউণ্টারের সামনে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর রক্তচক্ষু হেমাঝির হাতের বাইসেপের কাছে দেখা যায় কুঁজো 'নিয়ান্‌ডার্দাল মানুষ, (NEANDERTHAL MAN) উঁকি মারছে। ঠিক আমরা যে-জাতের মানুষ, অর্থাৎ 'HOMO SAPIENS' বা 'বুদ্ধিমান মানুষ,' সে-জাতের মানুষ কিন্তু 'নিয়ানডার্দাল ম্যান' নয়। বুদ্ধিমান মানুষের প্রথম চেহারা দেখা যায় হেমাঝির আগুনে

পোড়া কব্জির কাছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ, অর্থাৎ যাযাবর ও আদিম শ্রেণীহীন জীবন থেকে আরম্ভ ক'রে রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন পর্য্যন্ত ইতিহাস হেমাঝির হাতের তেলোতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। হেমাঝির হাতের আঙ্গুল মধ্যমার গোড়াতে আমেরিকা আবিষ্কৃত হ'ল। কোপানিকান থিওরী অনুযায়ী মানুষ প্রথম চেয়ে দেখল এই বিরাট পৃথিবীর দিকে আর পৃথিবীর তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রত্বের দিকে। মধ্যমার দ্বিতীয় রেখা পর্য্যন্ত পৌছতে দূর থেকে প্রথম শোনা গেল বাণিজ্য-বিপ্লবের (INDUSTRIAL REVOLUTION) কলরব, যন্ত্রের শব্দ। মানুষের জীবন-যাত্রায়, সমাজ-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এল। মধ্যমার তৃতীয় রেখার কাছে বাণিজ্য-বিপ্লবের প্রতিযোগিতায় (COMPETITION) ও প্রতি-ক্রিয়ায় ক্ষতবিক্ষত সমাজকে সমাজবিজ্ঞানী ডারুইন প্রথম শোনালেন জীবজগতের ক্রমবিকাশের কথা, মানুষের সভ্যতার নিষ্ঠুর ইতিহাস 'SURVIVAL OF THE FITTEST' অর্থাৎ রাজনীতিকের ব্যাখ্যায় 'জোর যার মুলুক তার'-বাণী। ক্রমবর্দ্ধমান যন্ত্রসভ্যতা ও ধনতান্ত্রিক সমাজের কাছে এ-বাণী নিষ্ঠুর হলেও মধুর বাণী, সাম্রাজ্যতন্ত্রের ইতিহাসের দীক্ষামন্ত্র। ডারুইনের এই অবদান জীববিজ্ঞানের ও ক্রমবিকাশের চিরদিনের রহস্যলোক আলোকিত ক'রে দিল। তারপর কি? ...

তারপর আমাদের হেমাঝির মধ্যমার ডগা ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফুটে বিষিয়ে পুঁজরক্তে ফুলে উঠেছে। চিরে বিষ বার ক'রে না দিলে স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। সেই আঙ্গুলের ডগায় বসে' পাকা দাড়িওয়ালা কার্ল মার্কস্ মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, "ভয় নেই, সমাজ ও সভ্যতা চির-প্রগতিশীল, তবে মন্থর

বা যান্ত্রিক নয়। ক্রমবিকাশের পথের বাঁকে বাঁকে বিপ্লব, এক বাঁক থেকে আর এক বাঁক অগ্রগতি।" মানুষ প্রথম শুনল অভয়বাণী। প্রথম বুঝতে চেষ্টা করল যে, সে একদিন রেফ্রিজারেটারের দইয়ের মতো ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাবে না। মানুষই তার সমাজ ও সভ্যতার স্রষ্টা ও কর্ত্তা। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, কর্ম্মের চাপে কর্ত্তার সত্তার রূপান্তর।...

কিন্তু হেমাঝির ফোলা আঙুলের ডগাটা আজও বিষিয়ে টাটাচ্ছে, অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। সার্জ্জেনের অপটুতার জন্যে অস্ত্রোপচার অনেক-বার ব্যর্থ হয়েছে; যেমন, গত মহাযুদ্ধের পর হয়েছে ইউরোপে, আবার আংশিক সফলও হয়েছে কোথাও দক্ষতার জন্যে; যেমন, বিশাল 'ইউনিয়ন অফ্ সোশ্যালিস্ট সোভিয়েট রিপাব্লিক্‌সে।' কিন্তু বদ্‌রক্ত আজও জমে আছে অনেকখানি। হেমাঝি মুখ ফুটে বলতে পারেনিঃ **'আঃ—বাঁচলাম!'**

প্রেম = বায়োলজি + কালচার

বাঁকা শ্যামের মতো শ্রীবদন বেঁকিয়ে সেদিন এক ভদ্দরলোক পান চিবুতে চিবুতে বললেন: "ও মহায়! স্যাম্যবাদ আইলে কি মাইয়া-মান্‌সের আবুর থাক্‌পে না? যোগো ইচ্ছা মতোন কি হ্যাগো পামু? হেয়া হেইলে অ্যাম্নেগো লগে মোরা আছি।" শুনে আমার পিলে চমকে উঠলো। ভদ্দরলোকের গালপাট্টা ও দাঁতের গুল্ দেখে ভড়কে গেলাম। বিতণ্ডা পাছে ষণ্ডের তাণ্ডবে পরিণত হয় সেই ভয়ে বললাম: "আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! দেখছেন না, সাম্যবাদ দেশে আসার আগেই মেয়েরা কিরকম জোর সাম্যের আন্দোলন করছে? এলে কি আর রক্ষা আছে? একেবারে ন স রমণ ন হাম রমণী।" ভদ্দরলোক হাসলেন। দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখলাম মাংসার্ত্ত ডালকুত্তার জিবের মতো তাঁর জিবটা লক্ লক্ করছে। মেয়েমানুষের নাম কি না? কন্‌ডিশণ্ড রিফ্লেক্স! এ তো

গেল একজন সাধারণ ভদ্দরলোকের কথা। এইবার একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীর (ইনি অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ) গবেষণামূলক এক প্রবন্ধ থেকে এই বিষয়ে দু'টি লাইন মাত্র উদ্ধৃত করছি : "এখনকার সামগায়ী কামচারী অর্থাৎ Communist যুগের কি সিদ্ধান্ত জানেন—যৌন ব্যবস্থা সম্পর্কে ? বিবাহ নয়, স্বেচ্ছাবিহার, marriage নয়—free love ; সতী নয় স্বৈরিণীই হ'ল এ যুগের অনুত্তমা নারী।" এই রকম আরও অনেক মতামত উদ্ধৃত করা যায়। সব মতামতের মধ্যে দু'টি বক্তব্য প্রধান। কেউ ভাবেন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যেদিন ভেদাভেদ থাকবে না, সেইদিন সভ্যতা হবে আদর্শ সভ্যতা, সমাজ হবে আদর্শ সমাজ। আবার কেউ কেউ ভাবেন সাম্যবাদীরা যে আদর্শ সমাজের বড়াই করে সেই সমাজে সভ্যতার নামে নারী-পুরুষের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা বাড়বে এবং স্বেচ্ছাচারিতাই হবে তথাকথিত সাম্য ও স্বাধীনতার রূপ।···

এই দু'ই দলের ধারণাই মারাত্মক ভুল। এরকম infantile ধারণা কোন কোন কম্যুনিষ্টেরও (?) আছে, কিন্তু সংখ্যায় তারা কম এবং left-wing-এর অন্তর্ভুক্ত! রাজনীতির ক্ষেত্রে কাণ্ডজ্ঞানহীন sectarianism যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে রঙ্গচিত্ত-সুলভ freedom-এর ধারণাও তেমনি নিন্দনীয় অপরাধ। শ্রেণী-সমস্যার পরই বোধ হয় মানব-সভ্যতার সব চেয়ে নিগূঢ় সমস্যা হ'ল নারী-পুরুষ-সম্পর্ক সমস্যা। অবশ্য নারী-পুরুষ-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান শ্রেণী-সমস্যাকে এড়িয়ে নয়, এবং শ্রেণী-সমস্যার সমাধানের সঙ্গে নারী-দাসত্বের সমাধান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর সঙ্গেই জড়িত পরিবার (family), সুনীতি (morality), প্রেম (love)। এককথায়, যা-কিছু আমরা জীবনের

সৌন্দর্য্য বলে' গর্ব্ব করি এবং জীবনের কদর্য্যতা বলে' নাকসিটকোই, সব এই নারী-পুরুষ-সম্পর্ককে কেন্দ্র ক'রেই সভ্যতার গোড়া থেকে গড়ে' উঠেছে। এত বড সমস্যা সম্পর্কে অনেকেই দেখি উদাসীন। এই উদাসীনতা ও অর্দ্ধজ্ঞানের ফলে অনেকেরই ভবিষ্যৎ সমাজের নারী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রেম, পরিবার, সুনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণাও বীভৎস। শুধু তাই নয়, সাহিত্য ও শিল্পকলার অন্যতম উৎস ও উপাদান হ'ল এই নারী-পুরুষ-সম্পর্ক, এই প্রেম। যৌন-সম্বন্ধ ও যৌন-নীতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে সাধারণের ভুল ধারণাকে exploit ক'রে এই আমাদের দেশেই কত ধ্বন্ধর, কত সাহিত্যিক ও কবির pornography বাজারে বেমালুম progressive বলে' চালু হয়েছে এবং আজও হ'চ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ...

প্রথমে প্রেমের কথাই বলি। হেদুয়া বা ঢাকুরিয়া লেকের ধারে প্রেমের গরলে যখন আধুনিক শ্রীরাধার "তনুমন বিবস খসএ নিবিবন্ধ" তখন আধুনিক শ্রীকৃষ্ণ একথা বলে না:

> মেঘ-মাল সয়ঁ তড়িত-লতা জনি
>
> হিরদয়ে শেল দই গেল।
>
> আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি
>
> আধহি নয়ন-তরঙ্গ।
>
> আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
>
> তবধরি দগধে অনঙ্গ॥

সে কি বলে জানেন? আধুনিক প্রগতিমার্কা কবির কাতরানি শ্রবণ করুন মন দিয়ে:

মোর কাছে এসে আজ যে-অঞ্চল
টানি দাও সুন্দর লজ্জায়,
জানি তাহা শ্লথ হবে কোনো এক রাতে
(তখন কোথায় আমি ?)
যে শঙ্কার শিহরণ তব দেহ লাবণ্যেরে
মোর কাছে করেছে মধুর।
(ওগো কঙ্কাবতী মধুর ! মধুর !)
জানি তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক
যবে চক্ষু মেলি
পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে
আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি।"

মন একে আদিরস বলতে চায় না এবং একেবারে ডাকসাইটে প্রেমিকা ভিন্ন বোধ হয় কোন নারীর প্রাণে এ-কাব্য প্রেমের ঝঙ্কার তুলবে না। এ একেবারে কাঁচা তালের রস, পান করলে তেরিমেরি করা ভিন্ন উপায় নেই। এণ্টনি সাহেব, ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রমুখ কবিয়ালদের চিতান-পরচিতান-ফুকা-মহড়ার কবিগান আদি-রসাত্মক কাব্য হিসাবে এর চাইতে অনেক সার্থক। যেমন :

"চোরাবাগানের চাঁপার বেটী চোপরা-কাঁটা চাঁদী,
ছোলা-দাঁতী ছুকরি হেমা, পদ্ম ছুতরের বেটী,
গোঁদলপাড়ার গোদা কমলী গেঁদা গোলবদনী,
ঘুস্কিপাড়ার ঘুসখাকী ঘোষাল ঘোল বেচুনী,
প্রেমানন্দে যায় তীর্থে প্রেমার বেটী পদী,
তরণীভরা তরুণী লয়ে বেয়ে যায় নদী॥"

অথবা এর চাইতেও সুন্দর :

"আমার বঁধুর সঙ্গে আমার পিরীত কেমন ছিল শুন—

যেমন মাটি আর পাটে, লোহা আর কাঠে।
দেবতা আর কুসুমে, জরি আর পশমে।
গুড়ে আর ছানায়, মুক্তা আর সোণায়।
সতী আর সুকান্তে, মিশী আর দন্তে।
মরিচ আর জিরে কাঁঠাল আর ক্ষীরে।
বাজানা আর গানে, চূণে আর পানে।
বাণে আর তূণে মাস্তুল আর গুণে।
দাতা আর দানে, জলে আর মীনে।
হাঁড়ি আর সরায়, গন্ধক আর পারায়।
নয়ন আর অঞ্জনে, অন্ন আর ব্যঞ্জনে।"

আমাদের দেশের এই কবিয়ালদের সঙ্গে উপরোক্ত প্রগতিমার্কা কবির পার্থক্য কোথায় ? বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলাভাষাকে সুন্দর ক'রে গড়ে তোলেননি, তাই কবিয়ালদের ভাষা অমার্জ্জিত, কিন্তু তাদের কাব্যিক উপমা ও কল্পনা আমাদের এ-যুগের বিদ্রোহী প্রেমের কবিদের তুলনায় অনেক বেশী জীবন্ত ও সুন্দর। "ওগো কঙ্কাবতী"-র প্রেম কবিয়ালদের প্রেমের চাইতে কোন্ দিক থেকে সুন্দরতর আমি অন্তত বুঝি না। ···

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধাকায় আমাদের সামাজিক নীতির অচলায়তন ভাঙতে আরম্ভ করল গত শতাব্দী থেকে। যাজ্ঞবল্ক্য-মনুর নীতির উত্তাপে সমাজের ভেতর যে দগ্‌দগে ঘা হয়েছিল তা চোখে পড়ল

বিদ্যাসাগরের। বৈষ্ণব কবিদের পর সাহিত্যেও নারী-পুরুষ সম্পর্কের মাধুর্য্য রূপান্তরিত হয়নি। কবিয়ালদের অপরের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করতে হত এবং তাদের কোন শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল না, সুতরাং সুরুচিও আশা করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রও যৌননীতির শূন্যতা লক্ষ্য করলেও তাকে ভাঙতে পারেননি। **বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় নারীকে মর্য্যাদা দিয়েছেন**। রবীন্দ্রনাথের প্রেম আদর্শ ও ইউটোপিয়ান প্রেম হ'লেও, তার মধ্যে যে উদারতা, গভীরতা ও মাধুর্য্য আছে তা আমাদের দেশের আর কোন শিল্পীর বা কবির দৃষ্টিতে বা উপলব্ধিতে নেই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথের ইউটোপিয়ান প্রেমের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়েছিল সেটা কালাপাহাড়ের বিদ্রোহ, ব্যর্থতা-ক্লিষ্ট, অবদমিত মধ্যবিত্ত মনের বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহকেই একদিন আমরা প্রগতি বলে' চেঁচামেচি করেছিলাম, কিন্তু তা আদৌ সুস্থ ও সুষ্ঠু নয়। আসলে সেটা কবিয়ালদের ভদ্রবেশী সংস্করণ। প্রেম ও নারী সম্পর্কে মনোভাব আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের পর এগোয়নি, বরং বেশ কয়েক পা পিছিয়ে প্রায় নবাবী আমলে পৌছেচে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর এবং সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নারীর নারীত্ব ও প্রেম সম্বন্ধে আমাদের দেশে এখনও পর্য্যন্ত সবচেয়ে বেশী প্রগতিশীল। কথাটা বেশ জোর দিয়েই আমি বলছি। ...

এখন কথা হ'চ্ছে, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-মশাই, যিনি কম্যুনিস্টদের যৌন-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বেচ্ছাবিহার ও free love-এর অভিযোগ করছিলেন, তিনি তাঁর নিজের সমাজ সম্বন্ধে কি বলবেন? যে-সমাজের কর্ণধাররা পুরুষের বহুবিবাহ এবং নারীর কঠোর বৈধব্যকে শাস্ত্রবিধি দিয়ে সমর্থন

করেন এবং তার ফলে সমাজের খিড়কি দিয়ে অনাচার, স্বৈরাচার ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেন, অজস্র হাফ-গেরস্তর জন্ম দেন, সে-সমাজ, সে-বিবাহ, সে-প্রেম সম্বন্ধে আমাদের গুণনিধি কি সাফাই গাইবেন? সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে, নারী-পুরুষ সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকলে তিনি ওরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য নিশ্চয়ই করতেন না। আর একা তাঁরই বা দোষ কি? নারী-পুরুষ সম্পর্ককে আমরা কি এমন সম্মান দিয়েছি সমাজে এবং সাহিত্যে? পুরানো যৌন-নীতির গণ্ডীর মধ্যে হয় ঘুরপাক খাচ্ছি, তা না হ'লে রচনা করছি কবি-য়ালদের ভাবচুরি ক'রে মার্জিত ভাষায় কঙ্কাবতীর তরঙ্গ-গান। পুরানো 'sex matrix' যেখানেই ভাঙতে গিয়েছি সেখানেই আর নতুন matrix গড়তে না পেরে উচ্ছৃঙ্খলতার জোয়ারে ভেসে গিয়েছি। তাকে তো আর প্রগতি বলা যায় না! যে-সমাজে

> "বেচে বাড়ীব পাটা কত বেটা ফাঁকি প্রণয় করে।
> বেড়ায় খিচুড়ী মেবে দ্বারে দ্বারে জেতের দফা সারে॥
> তাদের বাবুয়ানা, কি কারখানা, ধোপার কাপড় নিয়ে।
> কেবল তিলকাঞ্চনে রাত্রি কাটান; ছেড়া চেটায় শুয়ে॥
> থাকে হাটে পোড়ে; পত্নী ছেড়ে সদাই খুসী দিল্।
> জলপানের বরাদ্দ কেবল চৌকিদারের কিল্।"

—সে-সমাজে কঙ্কাবতীর কাব্যই প্রেমের কাব্য এবং উপরোক্ত নারী-পুরুষ-সাম্য-বিরোধী গোঁড়া বিদ্যানিধিরাই সভ্যতা ও প্রগতির এক একটি গথিক্ পিলার। ভবিষ্যৎ সমাজে এই স্বেচ্ছাচারিতা বা গোঁড়ামি কোনটাই থাকবে না। যে দিন পুরুষ ও নারী উভয়েরই জীবন সত্যিই স্বচ্ছন্দ ও

স্বাধীন হবে, কেউ কারও উপর কোন কারণে নির্ভরশীল হবে না, নারী যেদিন জমিদারের খাসতালুক বা ব্যবসাদারের পণ্য থাকবে না, সেইদিনই তো প্রেমিক বলবে প্রেমিকাকে রবীন্দ্রনাথের 'মানস সুন্দরীর' সুরে :

"আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা ঐ মুখখানি ॥"

আমি যতদূর জানি, সাম্যবাদের প্রবর্ত্তক যাঁরা সেই মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্-লেনিন যৌন-সম্পর্ক ও প্রেম সম্বন্ধে এই উক্তিই করেছেন। রুশ-বিপ্লবের পর হঠাৎ একটা পুরাতন গোঁড়া সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়ল। একটা বিরাট আলোড়ন ও ওলট্পালটের মধ্যে নীতির হাল ধরে' রাখা কঠিন। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেই কঠিন এবং তার চাইতে হাজার-গুণ বেশী কঠিন নৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে, কারণ সেটা জীবনের গভীরতম ক্ষেত্র। তাই প্রথম ধাক্কায় স্বেচ্ছাচার খানিকটা মাথা চাড়া দিয়েছিল সোভিয়েট সমাজে, কিন্তু তাই বলে' তাকে কোনদিন সমর্থন করা বা আস্কারা দেওযা হয়নি। লেনিন যতদিন বেঁচে ছিলেন পদে পদে তাব জন্যে তরুণ তরুণী, যুবক যুবতীদের তিরস্কার করেছেন, তীব্র সমালোচনা করেছেন, নির্ম্মমভাবে কটূক্তি করেছেন। লেনিন বলতেন, বিবাহ ও প্রেম হ'ল সভ্যতার সুন্দর ফুল, আর তার ফল হ'ল নবজাত সন্তান, নতুন জেনারেশান্। যৌন-সম্পর্ক নিয়ে ছেলে-খেলা করা তাই ক্রাইম। এর মধ্যে যেমন বায়োলজি আছে, তেমনি আছে কাল্চার। যৌন-সম্পর্ক বিবাহ ও প্রেমের ইতিহাসের সার কথা। জৈবিক ক্রমবিকাশ ও সভ্যতার ইতিহাসের মর্ম্মকথা। জীবনের শুরু থেকে, এ্যামিবা থেকে

এই মানুষ পর্যন্ত সেক্সের বিকাশ হয়েছে এই দিকে। এই ঐতিহাসিক ধারণা থাকলে আমরা প্লেটোও হবো না, কবিয়ালও হবো না, সভ্য মানুষের মতো নর-নারীর জীবন, যৌন-সম্পর্ক বিচার করব। তাতে প্রেমে পড়ার অসুবিধা হবে না, প্রেমের কাব্য লেখারও বাধা থাকবে না। "শেষের কবিতা"র নায়িকা ভাবী সমাজেই রক্ত মাংসের মূর্তি পাবে, তার আগে নয়, যে-সমাজে নারী স্থাবর সম্পত্তি না হয়ে হবে প্রাণদাত্রী নারী, হবে সবার উপরে মানুষ।

ম্যামালের ও মানুষের প্রেম

বিবাহ, প্রেম, পরিবার, স্থনীতি — এক কথায় নরনারীর জীবনের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আগে বলেছি যে, স্বেচ্ছাচারিতা যেমন স্বাধীনতা নয়, অবাধগতি মাত্রই যেমন প্রগতি নয়, তেমনি যৌন-স্বাধীনতার অর্থও যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ফিউডাল যুগের অসূর্যাম্পশ্যারা প্রাথমিক ক্যাপিটালিস্ট যুগে সূর্যের মুখ দেখল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাণী ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে দীক্ষা নিল। কিন্তু এই বিদ্রোহটা প্রথমে চালিত হ'ল পুরুষদের বিরুদ্ধে। পুরুষদের আধিপত্যের ঐতিহাসিক কারণ না সন্ধান ক'রে নারীর বিদ্রোহ মূর্তি পেল পুরুষ-বিরোধী আন্দোলনে (anti-Man movement)। পুরুষদের হাবভাব, চালচলন, কাজকর্ম অনুকরণ ক'রে, সাম্যের জয়ডঙ্কা বাজানোই হ'ল তার আদর্শ। তারপর ক্যাপিটালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায়

যখন চারিদিক থেকে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হ'ল তখন আরও বিকট মূর্তি ধারণ করল এই "যৌনসাম্য"। নারী ক্রমে পরিণত হ'ল পণ্যে (commodity), এবং commodity fetishism-এর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজে নরনারীর অবাধ মিলনের ও স্বাধীনতার অর্থ হ'ল **'নারীকে ভোগের জন্যে ভোগ করা'**। যেমন মুনাফার জন্যে আরও মুনাফা দরকার, তেমনি নারীকে ভোগের জন্যে তাকে স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে আরও বেশি উচ্ছৃঙ্খলতা, আরও বেশি অবাধ-মিলনের সুযোগ দেওয়া দরকার। পশ্চিমের ক্যাপিটালিস্ট সমাজে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা, তার আসল রূপটা হ'ল এই। প্রভুত্বের ও শোষণের যে-মন্ত্র, যে-ব্যবস্থা, তাকে কায়েম রেখে মানবজাতির এত বড় একটা অংশ 'নারী' কখনও সত্যিকার স্বাধীনতা পেতে পারে না, এ-কথাটা পশ্চিমের আধুনিকারা বোঝেননি। তাই আজ তাঁরা যতই স্কার্টের ছাঁট বদলে রাস্তায় ট্রট্ করুন না কেন, তাঁরা নিজেরাও মনে মনে বোঝেন এবং তাঁদের পুরুষবন্ধুরাও জানেন যে তাঁরা স্বাধীন নন। কথায় কথায় divorce করার ক্ষমতা পেলেই স্বাধীনতা পাওয়া হ'ল না।

ও-দেশের মেয়েদের স্বাধীনতার বিচার করতে হয় আদালতে divorce-এর তালিকা দেখে। divorce এর সংখ্যা যত বাড়বে বুঝতে হবে তত মেয়েরা স্বাধীন হ'চ্ছে। ঠিক তেমনি পারিবারিক বিশৃঙ্খলা যত চরমে পৌছবে, নীতিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামে দুর্নীতি ও কু-নীতি যত প্রশ্রয় পাবে তত বুঝতে হবে মেয়েরা সাম্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। একে স্বাধীনতার আন্দোলন বলে না, বলে অরাজকতার হৈ-হল্লা, বলে 'He-woman' আন্দোলন, যার অর্থ হ'ল মানুষের

পর্য্যায় থেকে মেয়েদের ক্রমে আরও ভোগের সামগ্রীর ও সম্পত্তির পর্য্যায়ে নামিয়ে আনা এবং দাসত্বের ডাণ্ডাবেড়ী আরও কড়া ক'রে তাদের হাতে পায়ে পরিয়ে দেওয়া। ...

নর-নারীর সম্পর্ক সভ্যতার একটা বড় মাপকাঠি। স্ত্রী-স্বাধীনতা আমাদের সভ্যতার আদর্শ। আমাদের সমাজ ও সভ্যতা ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এগিয়ে যাবার সময় মেয়েদের সব সময় সচেতন থাকা উচিত তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে। নারীর মুক্তি-আন্দোলন কোন্ পথে চালিত হ'লে সত্যিকার মুক্তি আসবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে পথ ভুল হবার সম্ভাবনা এবং পদে পদে ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আমার আলোচনার গণ্ডী ছাড়িয়ে যাচ্ছি আমি। কথাপ্রসঙ্গে অন্য কথা এসে যাচ্ছে। যাই হোক—কথা হ'চ্ছে, ভবিষ্যতে যখন আমাদের সমাজ ও সভ্যতা আরও অনেক উন্নত হবে তখন কি পারিবারিক বন্ধন বলে' কিছু থাকবে না? যৌন-স্বাধীনতা কি তখন অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচারের রূপ নেবে? নীতিবাদ না মানলেও সুনীতি বলে' কি কোন পদার্থ তখন থাকবে না? প্রশ্নগুলো আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে জটিল। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আদৌ তা নয়। সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে চলনসই জ্ঞান থাকলে এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব সহজ বলেই মনে হয়। এসব প্রশ্নের জবাব হ'ল, পারিবারিক বন্ধন থাকবে, কিন্তু সে-বন্ধন খাঁটি স্নেহ, ভালবাসা, প্রেমের বন্ধন। যৌন-স্বাধীনতার চূড়ান্ত অর্থ হবে 'monogamy' বা এক-বিবাহ, আদালতে 'divorce'-এর কোঠায় শূন্য নামবে উন্নততম সভ্য সমাজে। নীতিবাদের দাসত্ব ও গোঁড়ামি

না থাকলেও সুনীতির স্বাভাবিক বাঁধুনি একশবার থাকবে, কারণ ভবিষ্যতের সভ্য সমাজ নিশ্চয়ই জঙ্গল হবে না! কথাগুলো সোজাসুজি বলা হ'ল, একটু তলিয়ে দেখা যাক, কারণ, ও-দেশের নামজাদা মনস্তত্ত্ববিদরা ধরে নিয়েছেন, পরিবার ও সুনীতি বলে' আর কিছু থাকবে না। চোখের সামনে তাঁরা কেবল 'ogre of sex' দেখছেন। পারিপার্শ্বিক ব্যভিচার ও স্বৈরাচারে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা দেখছেন পৃথিবীটা যেন একটা পাগলাগারদ অথবা শৌণ্ডিকালয়। সব ময়লা, সব আবর্জনা নিয়েও পৃথিবীটা বা সভ্যতা তো সত্যিই তা নয়। আসলে এই সব মনস্তত্ত্ববিদরা 'hysteria' দেখে তাকে ভুল করলেন 'history' বলে'। কিন্তু 'হিস্ট্রি' তো হিস্টিরিয়া নয়। তবে হিস্ট্রি কি? ...

মানুষের দেহে অসংখ্য cell আছে, সেই সেল নিয়ে tissues, আবার তাই নিয়ে organs—তার উপর আছে brain, আর nerves হ'চ্ছে পাহারাওয়ালা। এ্যামিবার কিন্তু একটিমাত্র cell—সে তাই দিয়ে খায় দায়, সংসার ধর্ম্ম করে। এদিক থেকে এ্যামিবা হ'ল সব চেয়ে স্বাধীন এবং উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। খেয়ে-দেয়ে ফুলেফেঁপে এ্যামিবার যখন প্রজননের (reproduction) সময় আসে তখন সে নিজে থেকেই দু'ভাগ হয়ে যায়। দু'টো এ্যামিবা যখন জড়াজড়ি করে তখন দু'টোকেই মনে হয় sexual organ—এবং তারপর তারা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, আর মেলে না। এ্যামিবা থেকে সভ্য মানুষ হতে অনেক ধাপ, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পেরোতে হয়েছে নিশ্চয়ই। এই প্রগতির মধ্যে দুটো ধারা হ'চ্ছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হ'ল জটিলতা অর্থাৎ দেখা গিয়েছে জীব-জগতের যতই বিকাশ হয়েছে ততই জীবন জটিলতর হয়েছে এবং

সবচেয়ে জটিলতম জীবন বা জীব হ'চ্ছে মানুষ। আমরা যে পরিবার ও যৌন সম্বন্ধের কথা বলছিলাম তার বীজ দেখা গেল স্পঞ্জের মধ্যে, মৌমাছির মধ্যে, ব্যাঙের মধ্যে, পাইথনের মধ্যে, পাখীর মধ্যে। তারপর নানারকম ম্যামালের মধ্যে দেখা গেল প্রধানত দুরকমের পারিবারিক সম্বন্ধ। একরকম হ'ল বাঁদর (ape) এবং মানুষ, যাদের বলা হয় 'চির-প্রেমিক' (perennial lovers), আর একরকম হ'ল অন্যান্য ম্যামালদের, যারা সাময়িক প্রেমিক (seasonal lovers)। আমরা জানি, পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হ'ল বাপমায়ের দায়িত্বজ্ঞান ও পারস্পরিক কর্ত্তব্যবোধ। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর প্রেমিকের মধ্যে যারা সাময়িক প্রেমিক বা 'seasonal lovers' (জন্তু-জানোয়ারই বেশী) তাদের মধ্যে এই দায়িত্ববোধের ভয়ানক অভাব, নেই বললেই হয়। পিতৃত্বের দাবীকে বা দায়িত্বকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যামালরা একেবারেই স্বীকার করে না, মাতৃত্বের দায়িত্ব মায়েরা খুবই সামান্য স্বীকার করে। বিবাহ বা দাম্পত্য-জীবন বলে' তাদের কোন কিছুই নেই, উভয়ের মিলনের একমাত্র সম্বন্ধ হ'ল সঙ্গমের সম্বন্ধ, সাময়িক যার উত্তেজনা অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দেয়, আবার থিতিয়ে যায়। যৌনক্ষুধা না জাগলে কেউ কারও দিকে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষ হয়, তার কারণ মানুষ 'চির প্রেমিক,' তার প্রেম অনন্ত চিরমধুর, সাময়িক নয়। 'কাম' কথার যে কদর্থ করা হয় সে-অর্থ বাদ দিয়ে বলা যায় মানুষ 'চিরকামুক', এবং এই 'চিরকামুকতা'র (perennial eroticism) জন্যেই মানুষের জীবনে অচ্ছেদ্য পারিবারিক সম্বন্ধ গড়ে' তোলা সম্ভব হয়েছে। একদল নীতিবাগীশ মানুষের এই 'perennial eroticism'-এর বিরুদ্ধে নাকসিটকান, বিশেষ ক'রে

ভণ্ড ও গোঁড়া ব্রহ্মচর্যবাদীরা। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান : "...only among mates with a year-round sexual need for one another could the year-round partnership of the human family develop". ...

এখন কথা হ'চ্ছে মানুষ যদি সমাজ-ব্যবস্থার গুণে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যামালের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন seasonal lovers হয়, তা হ'লে মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না বা সমাজকে অভিশাপ দিয়েও লাভ নেই। বিষাক্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে বদলাতে হয় আগে, যে-ব্যবস্থায় পুরুষ-নারীর সম্বন্ধ মানুষের সম্বন্ধ নয়, জানোয়ারের সম্বন্ধে পরিণত হয়েছে।

"জীবন চাহি জৌবন বড় রঙ্গ"

মানুষ মাত্রেই প্রেমিক। শিশুর প্রেম প্রথম সমুদ্রদর্শনের মতো। বালুতটের উপর দাঁড়িয়ে দেখছি ঢেউয়ের পর ঢেউ, কূলকিনারাহীন, দিগন্ত রেখায় বিলীন, সীমাহীন অস্পষ্টতায় ও বিস্ময়ে অপূর্ব্ব সুন্দর। কানুর ভাল লাগে মিনুকে। দু'জনে খেলা করে একসঙ্গে, একমনে বসে বসে বাঁধে খেলাঘর। পুতুলের বিয়েতে ঘরকন্না গুছাতে ব্যস্ত থাকে মিনু। ঝাঁকড়া চুল নেড়ে কানুকে ধমক দিয়ে শুনিয়ে দেয়ঃ "মেয়েটা কাল শ্বশুরবাড়ী চলে' যাবে, বাজারহাট করবে কখন?" চারদিনের জমানো চারটে পয়সা দিয়ে এক ফিরিওয়ালার কাছ থেকে ছোট্ট এক শিশি স্নো কিনে আনে কানু। মিনু হয়ত আড়চোখে কানুর দিকে চাইতে চাইতে পিণ্টুর সঙ্গে একদিন পার্কে গিয়ে দু'জনে একসঙ্গে দোল্নায় দোল খেলে এল, এদিকে আষাঢ়ের মেঘ নামল কানুর মুখে। মার্ব্বেল নিয়ে মারপিট হয়ে গেল হঠাৎ অকারণে কানু আর পিণ্টুর মধ্যে। কানু লড়ছে

পিণ্টুর সঙ্গে, মিনু দেখছে। কানু আছাড় খায়, চোখমুখ লাল হয়, ধুলো ঝেড়ে ফেলে আবার সাপ্‌টে ধরে পিণ্টুকে। বেকায়দায় পড়ে পিণ্টু চিৎ হয়ে যায়। বীর ল্যান্সিলটের মতো কানু একবার চেয়ে দেখে মিনুর দিকে। মিনু হাসে আর বলে, "ইঃ—ভারি তো, পারলে না।"…

কানু ঠাকুমার কাছে শুয়ে রূপকথার রাজকন্যার গল্প শোনে। আকাশে মেঘের কোঁকড়া চুল উড়িয়ে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে উড়ে চলেছে মিনু, পাশে রাজকুমার কানু, হাতে তলোয়ার। মেঘ-পুরীর দৈত্যদের কানু তলোয়ার ঘুরিয়ে টুক্‌রো ক'রে ফেলছে। শিশুর প্রেম। তারপর বয়ঃসন্ধি। যাদু ও বিস্ময়ে ভরা রাত্রি চুপিসাড়ে কখন ভোর হয়েছে। মিনুর অমন আড়াল দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মানে কি? যা কাছে ছিল, ক্রমে তা দূরে সরে যাচ্ছে, আর যত দূরে সরে যাচ্ছে ততই বাড়ছে কাছে পাবার ব্যাকুলতা।

খনে খনে দসন-ছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু-বাস॥

হৃদয়ের মুকুল দেখে ক্ষণে ক্ষণে মিনু আঁচল টেনে দেয়, আবার ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। কানু অবাক হয়ে ভাবে।

বিদ্যাপতি কহ সুন বর কান।
তরুণিম সৈসব চিহ্নই ন জান॥

বিদ্যাপতি বলেছেন, সুন্দর কানু, শৈশব ও তারুণ্যের চিহ্নই তুমি জান না। কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর সোনার টুকরো ছড়িয়ে সূর্য্য উঠলো। খেলাঘর ফেলে রেখে মিনু একদিন সত্যিই চলে গেল শ্বশুরবাড়ী। কানু বুঝল সেইদিন। পৃথিবীটা মরুভূমির মতো রিক্ততায় ধূ ধূ করছে।…

কবি সেইজন্যেই বলেছেন: "জীবন চাহি জৌবন বড় রঙ্গ।" জীবনের চাইতে যৌবনের রঙ্গ বেশী। "সুপুরুষ প্রেম কবহু নহি ছাড়, দিনে দিনে চন্দ্রকলা সম বাড়।" সুপুরুষের প্রেম কখনো ছাড়তে নেই, কারণ সে প্রেম দিনে দিনে চন্দ্র-কলার মতো বাড়ে। আমাদের সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের জীবনে যাই সত্য হোক্ না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত প্রেমিক ক্যাসানোভার (Casanova) জীবনে হয়ত এইটাই সত্য ছিল। ক্যাসানোভা তাঁর Memoires-এর মধ্যে বলেছেন: "I have always loved women and have done my best to make them love me." ক্যাসানোভার এই প্রেমের এ্যাডভেঞ্চার হ্যাভলক এলিস্ (Havelock Ellis) সমর্থন করেছেন, কারণ ক্যাসানোভা বিংশ শতাব্দীর মতো প্রেমের ফাট্‌কা-বাজারে নিজের জীবন যৌবন ধনমান ক্ষয় করেন নি। প্রেমের বেচাকেনা করতেও তিনি জানতেন না। কবির কাছে কাব্য যেমন, শিল্পীর কাছে চিত্র যেমন, সুরকারের কাছে রাগরাগিণী যেমন, ক্যাসানোভার কাছে তেমনি ছিল প্রেম, তাঁর সৌন্দর্য্য ও সঙ্গতি-বোধের চরম ও পরম প্রকাশ। ছন্দে, বর্ণে, ভাস্কর্য্যে সুন্দরের অনুভূতিকে যেমন শিল্পী প্রকাশ করেন, ক্যাসানোভাও তেমনি তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করতেন প্রেমে। প্রেম ছিল তাঁর সৃষ্টি আর্ট, তিনি ছিলেন প্রেমের আর্টিস্ট। ক্যাসানোভাকে যিনি লম্পট বলেন, তাঁকে এলিস্ সাহেব বেয়নেট-বিদ্ধ করতেও রাজী আছেন। এলিস্ বলেন: "Casanova loved many women, but broke few hearts ... A man of finer moral fibre could scarcely have loved so many women, a man of coarser fibre could never have left so many women

happy." তার কারণ কি ? তার কারণ, ফ্রয়েড ও Underworld-এর যৌনবিজ্ঞান পড়ে ক্যাসানোভা মানসিক ডিস্‌পেপসিয়ায় ভোগেন নি। ক্যাসানোভা bank balance দেখিয়ে, চেক্‌বই নাচিয়ে, মাস্টার বুইক্ চালিয়ে প্রেমের ঢেউয়ে ওঠানামা করেন নি, পাতালে তলিয়েও যাননি। প্রেম তাঁর কাছে মাংসাশী পশুর হিংস্রতা ছিল না, ছোবল-মারা বা থাবা দিয়ে আঁচড়ে-নেওয়ার মধ্যে তার সার্থকতা ছিল না। পণ্য-পাগলামি ও মুনাফালোভের বিষে জর্জ্জরিত সমাজে প্রেম বা প্রেমিকা যেমন ম্যানুফ্যাকচার্ড কমোডিটি, ক্যাসানোভার কাছে প্রেম সেরকম কমোডিটি ছিল না। ক্যাসানোভার জীবন মানুষের আদর্শ নয়, সমাজের আদর্শ নয়, একশবার নয়, কিন্তু এ-যুগের পণ্যোন্মত্ত, মুনাফা-কাঙাল, নগ্ন কাম-বীজাণু-সংক্রামিত সমাজের মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ ছিলেন ক্যাসানোভা। সুন্দর ও আদর্শ প্রেমের আজীবন পূজারী ছিলেন তিনি। তার কারণ, হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ বলেছেন : "He had fully grasped what the latest writer on the scientific psychology of sex calls the second law of courting, namely, the development on the male of an imaginative attentiveness to the psychical and bodily states of the female, in place of an exclusive attentiveness to his own gratification. It is not impossible that in these matters Casanova could have given a lesson to many virtuous husbands of our own highly moral century. He never sank to the level of the vulgar maxim that 'all's fair in love and war. ... ... "

এ যুগের নীতিকথা হ'ল War, Wine ও Women এবং "All's fair in love and war." ক্যাসানোভা ছিলেন এ-নীতির

বিরোধী। তাই এলিস্ সাহেব বলেছেন যে, ক্যাসানোভার জীবনী থেকে আমাদের এই অতি-নৈতিক যুগের অনেক বকধার্ম্মিক স্বামী অনেক শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারেন। আমার মিনু যখন পাঁচ বছর পর ঘরে ফিরে এল, তখন সে তিন সন্তানের জননী বটে, কিন্তু 'নারী' নয়। রুগ্ন শীর্ণ, পাণ্ডুর মুখের উপর তার দুশ্চরিত্র, লম্পট স্বামীর গোপন অত্যাচারের বিভীষিকা। অথচ স্ত্রীর জীবন-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এমন নীতিবাগীশ স্বামীর জোড়া মেলা ভার। কানু তখন তার মধ্যবিত্ত সমাজের বিষ আকণ্ঠ পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছে। তখন সে কালেজী শিক্ষা পেয়ে এলিয়টের কবিতা পড়ছে, "Birth and copulation and death." শুধু পড়ছে না, তার সঙ্গে জীবন যোগ ক'রে এই মহাসত্য উপলব্ধি করছে মর্ম্মে মর্ম্মে। শিখবার মতো দু-চার কথা ক্যাসানোভাও এদের বলতে পারেন বৈ কি! আর সমাজের আর্থিক দুর্গতি ও নৈতিক অবনতির চাপে যাঁরা জপতপরত পূর্ণ-গেরস্ত থেকে হাফ-গেরস্ত ও সিকি-গেরস্তর পদে অবনীত হয়েছেন তাঁদেরও 'art of love-making' গোড়া থেকে শেখা উচিত। জীবনে ধূসরতা ও ক্লীবত্বই যাঁদের চরম সত্য, কি কবি, কি গৃহস্থ, আমার অনুরোধ তাঁরা সকলেই প্রেমে পড়ুন, প্রেম করুন। বুবুল-কিকিরার প্রেম নয়, লেডী চ্যাটার্লির প্রেম নয়, মানুষের প্রেম, জৈবিক (biological) মানুষ ও সভ্য (cultured) মানুষের প্রেম। ...

এ-যুগের মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় অভিশাপ হ'ল এই যে, সে প্রেম করতে ভুলে গিয়েছে। মানুষ আজ 'animal', মানুষ আজ 'intelligent', মানুষ আজ 'hero', কিন্তু মানুষের মধ্যে আজ আদর্শ 'lover'

কোথায় ? বিশ্ববিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক ভরোনফ (Voronoff) সারা জীবন মানুষকে পুনর্জীবিত (regenerate) করার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্নকে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সত্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। মুমূর্ষু গাছপালাকে পুনর্জীবিত করার জন্যে যেমন আমরা জোড়কলম বাঁধি, মুমূর্ষু ক্ষয়িষ্ণু ও অপরিণত মানুষকেও পূর্ণ জীবন্ত মানুষ করার জন্যে ভরোনফ তেমনি জীবজন্তুর গ্রন্থি-সন্নিবেশ (grafting of glands) সম্বন্ধে পরীক্ষা করেছেন এবং কৃতকার্য্যও হয়েছেন। এ-কাজে তাঁকে সাহায্য করেছে বাঁদরই বেশী, অর্থাৎ বাঁদরের গ্রন্থি নিয়েই তিনি পরীক্ষা করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ঋণ শোধ করার জন্যে জন্তুজানোয়ারের প্রেম ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন। এই বইতে তিনি বলেছেন যে, মানুষের প্রেমের চাইতে অপেক্ষাকৃত কম "পাশবিক" (bestial) জন্তুজানোয়ারের প্রেম। অধিকাংশ পশুপক্ষী পূর্বোক্ত এলিস্ সাহেব সমর্থিত "Second Law of Courting" সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। মানুষ আজ এই প্রেমকে লোভ, হিংস্রতা, প্রতিযোগিতা ও জঘন্য ব্যবসাদারির পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছে। এ্যাডামের শুধু স্বর্গ থেকেই পতন হয়নি, মর্ত্ত্য থেকে পাতালের সীমাহীন অন্ধকারে তার পতন হয়েছে। ···

কিন্তু প্রেম প্রতিভার অন্যতম প্রেরণা। আলো-জলবায়ুর মতো প্রেম প্রতিভার কুঁড়ি ফুটিয়ে তোলে। প্রেমের স্পর্শে পাঁপড়ি মেলে প্রতিভা। ভরোনফ বলেন, "Love stimulates Genius. Imagination driven by desire beautifies women, beautifies life". বড় বড় প্রতিভাবানের জীবনে একথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিখ্যাত সুরকার রিচার্ড ভাগনর মধ্য বয়সে প্রেমে পড়ে, Tristan and Isolde স্বরসঙ্গীত রচনা

করেন এবং চৌষট্টি বছর বয়সে যুডিথের সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় প্রেম হয় তারই অবদান হ'ল তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচনা "Parsifal". জার্মান কবি গোটে চুয়াত্তর বছর বয়সে সতর বছরের বালিকা লেভেট-জোর প্রেমে পড়েন এবং একবারে বসে তাঁর বিখ্যাত এলিজি লেখেন। আশী বছর বয়সেও বৃদ্ধ ভিক্টর হিউগো প্রেমের ছলাকলা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রিয় নাতিটিকে সব সময় বলতেন: "You must love my son, love well—all your life." মহাকবি দান্তে দশ বছর বয়সে বিয়াত্রিচ-এর প্রেমে পড়েছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে বিয়াত্রিচ মারা যায়, কিন্তু দান্তের "The Divine Comedy" অমর হয়ে আছে। এরকম দৃষ্টান্ত খোঁজ করলে অনেক দেওয়া যেতে পারে। ...

সৃজনীপ্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির অফুরন্ত উৎস প্রেম। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, "When the genital glands wither, supply less of their precious fluid, the mind becomes dulled." যখন মানুষের যৌন-গ্রন্থি শুকিয়ে যায় তখন বুদ্ধির ধার থাকে না, মন নীরস হয়ে যায়, চোখের সামনে পৃথিবী জুড়ে সরষের ফুল ফুটে ওঠে, ন্যাবায় ভোগা রুগীর মতো চারিদিকে কেবল ধূসরতা, হাহাকার ও হতাশাই নজরে পড়ে। (আর্থিক অবস্থাকে ধন্যবাদ) যাঁদের শিল্পকলা ও কাব্যসাহিত্যে এই হতাশা, হাহাকার, ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ স্পষ্ট তাঁরা একবার বৈজ্ঞানিকের উপদেশ মতো পরীক্ষা করতে পারেন।

সাম্যবাদ = বিদ্যুৎ + সোবিয়েত্

একবার ঢাকায় এক সম্মেলনে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর নিজের গবেষণার বিষয়টি যতদূর সম্ভব সরলভাবে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার পর জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক (স্থানীয় আদালতের একজন প্রবীণ উকিল) তাঁকে উঠে বলেন ঃ "আরে মশায়, বকরবকর তো অনেক কিছুই করলেন, তা গবেষণাডা অইল কি ? **ব্যাবাক তো আমাগো ব্যাদেই আছে।**" সাহা মহাশয় তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানান, বেদের কোনখানে আছে বলতে। ভদ্রলোক রেগে টং হয়ে সাফ জবাব দেন, "ব্যাদ আবার পড়ুম কি মশয়, শুনছি—।" বেদ ও বৈদিক যুগের পর যে পৃথিবীর মানুষ ও সমাজ এগিয়েছে একথা আমাদের দেশের শতকরা নব্বুই জন শিক্ষিত লোক আজও বিশ্বাস করেন না। এটা আমার হঠোক্তি নয়, খাঁটি সত্য

সম্বন্ধে খেদোক্তি। প্রমাণ করতে হ'লে এখানে অনেক স্বনামধন্য বিদ্বান্ 'লৌহ-ভীমের' কথা উদ্ধৃত করতে পারি, কিন্তু যেহেতু এ-রাজত্বে অনেকে সিংহাসনের উপর বসে আজও ঈশ্বরের কৃপায় ইতর ও মূর্খদের বিদ্যা বিতরণ করছেন তাই আপাতত নাম প্রকাশের কেলেঙ্কারী থেকে তাঁদের রেহাই দিলাম। ···

প্রবীণ উকিলের কথা শুনে হঠাৎ মনে পড়ল আমার বুড়ী তালুইমা আর বুড়ো বিকল-মালীর কথা। একবার আমার তালুইমাকে কোন অনিবার্য্য কারণে পালকি ছেড়ে ট্রেনে চাপতে হয়েছিল, সঙ্গে ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ আমার বড় দাদামশাই অম্বিকাচরণ। তালুইমা তো কিছুতেই ট্রেনে উঠবেন না, অনেক কষ্টে তাঁকে চ্যাংদোলা ক'রে তোলা হ'ল কামরায়। ট্রেন হুস্ হুস্ ক'রে চলতে লাগল। তালুইমা কামরার তুদিকের ধাবমান গাছপালা, মাঠ, মানুষ, গরুর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে দাদামশাইকে জড়িয়ে ধরে' কাঁদু কাঁদু হয়ে বললেন: "ও অম্বু! মান্‌ষিতি না, গরুতি না, একি ভূতি ওড়ায় নে যাচ্ছে?" দাদামশাই গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন: "হু—যাচ্ছে তো হইচ্ছ কি?" তালুইমা আর থাকতে না পেরে বললেন: "ন্যামে পড়্ ন্যামে পড়্, কোন্ খাদাড়ে নিয়ে গিয়ে ফ্যাল্‌বানে—"। হাসবেন না, তালুইমা শিক্ষিতা নন। তিনি যখন বধূবেশে শ্বশুরালয়ে আসেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হামাগুড়ি দিচ্ছেন, বর্ণপরিচয় বা বোধোদয় লেখা আরম্ভ করেননি। এ-তো গেল তালুইমার কথা। এবারে বিকলমালীর কথা বলি। আমাদের মামাবাড়ীর বহু পুরাতন মালী বিকলমিঞাকে আমরা দেখা হ'লেই বলতাম: "বিকল, একবার কলকাতা ঘুরে এস, তু'কুড়ি টাকা হ'লেই

হবে !” গ্রাম ছেড়ে বিকল জীবনে বাইরে যায়নি, কলকাতা একবার ঘুরে আসবার সখ ছিল খুব। বিকলের একটা কথাই ছিল, “কলকাত্তা যে না গেছে সে মায়ের গর্ভেই আছে।” আমরা ভাইবোন মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিকলকে কলকাতার আজব গল্প শোনাতাম, কারণ না শুনিয়ে উপায় নেই, বিকল কাজ সেরে সন্ধ্যার পর এসে বলত, “দাদু, শহরের গল্প শোনাও—”। আমরা শোনাতাম : হাজার হাজার মটর পিঁপড়ের মতো সারবেঁধে চলেছে, বড় বড় দোতালা-তেতালা বাস, ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, বিশতালা, পঁচিশতালা বাড়ী, কলের পাল্কিতে লোক উঠছে নামছে, হোটেল-হাসপাতাল স্কুল-কলেজ— এলাহি কাণ্ডকারখানা।' আর সে রাস্তা কি ? বড় বড় দালানবাড়ীর মেঝের মতো চক্‌চক্ করছে, তার ওপর দিয়ে ছোট ছোট রেলগাড়ীর মতো চলেছে ট্রামগাড়ী, ইঞ্জিনে নয়— বিদ্যুতে। শহরের এক জায়গায় গানবাজনা, থিয়েটার বক্তৃতা হ'চ্ছে, আর লক্ষ লক্ষ লোক ঘরে বসে তাই শুনছে। মেয়েরা ঘোমটা দিচ্ছে না, বোর্‌খা পরছে না, দৌড়ঝাঁপ করছে, হাসছে, খেলছে, সাঁতার কাটছে, চাকরি করছে অফিসে, ছেলেদের সঙ্গে পথেঘাটে কথা বলছে, মেম্-সাহেবেরা পুরুষদের হাত ধরে ঝাঁকুনী দিচ্ছে, কোমর জড়িয়ে ধরে ছেলে-মেয়েরা চলেছে পথের উপর দিয়ে—।” বিকলমিঞার পাকা দাড়ির মধ্যে ঠোঁট দু'টো ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে যেত, সাদা ভ্রূজোড়ার তলায় চোখ দু'টো আসত স্থির হয়ে। তখন ভাবতাম তালুইমা, বিকলমিঞা, এরা সব জংলী ভূত, বেচারী! জ্ঞান হতে আজ বুঝতে পারছি উপরোক্ত শিক্ষিত উকিল মশাইয়ের শ্রেণীর লোকের চাইতে আমার তালুইমা, বুড়ো বিকল-মিঞার শ্রেণীর লোক অনেক বেশী ‘প্রগ্রেসিভ’। কারণ তারা তাজ্জবকে

তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়নি, বলেনি 'ব্যাদে আছে, কোরাণে আছে।' তারা কান পেতে শুনেছে মানুষের বৈজ্ঞানিক অভিযানের কথা, বুঝেছে তাদের যুগ আর নেই, সরলভাবে বিশ্বাস করেছে মানুষের ক্ষমতাতে, বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে। তারা মাদুলি আর মাম্‌দো ভূতে বিশ্বাস করলেও উড়োজাহাজ আর বৈদ্যুতিক আলোকে আলাদা ক'রে দেখেছে, স্বীকার ক'রে নিয়েছে শেষের দু'টো মানুষেরই জ্ঞানের আবিষ্কার, প্রকৃতির উপর মানুষের জয়। শিক্ষিত পণ্ডিতের মতো তারা বিজ্ঞানের ঘাড়ে মাম্‌দোভূতকে চাপায়নি, বলেনি বিজ্ঞান বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে বিজ্ঞান পুরানো ভূতের গল্প নূতন কায়দা ক'রে বলা। ...

আমাকে কে শোনায় তার ঠিক নেই, আমি একদিন বিকলমিঞাকে বিজ্ঞানের গল্প শুনিয়েছি মনে হ'লে আজ হাসি পায়। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ বা আল্‌ডুস্ হাক্সলীর 'ফ্যানটাজিয়া' বাদ দিলেও যদি আজ বিজ্ঞানের সাধকদের কাছে গিয়ে একঘণ্টা দাঁড়াতে হয় তা হ'লে যা গল্প তাঁরা শুনিয়ে দেবেন তাতে আমি কেন, অনেককেই বিকল মালী বনে' যেতে হবে। কেউ বলবেন, "কয়লা আর তেলই তো এতদিন সবকিছুর শক্তি জুগিয়েছে, কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীর কয়লা আর তেল উজাড় হয়ে যাবে, তখন হবে কি ? জল আছে কিন্তু সব জায়গায় বা সব সময় জল প্রচুর পাওয়া যায় না। বাতাস আছে। বাতাস থেকে শক্তি নিয়ে জমিয়ে রাখতে হবে, বড় বড় উইণ্ডমিল থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি গোটা শহর, গোটা দেশে সরবরাহ করতে হবে। আমরা এখন সেইদিকেই নজর দিচ্ছি, কারণ পৃথিবীর কয়লা ও তেল ফুরিয়ে এল!" কেউ বলবেন, "কাঁচা

লোহা ও কাদা (clay) কিভাবে আরও কাজে লাগানো যায় তারই চেষ্টা করছি আমরা। কাদার মধ্যে ২৪% এলুমিনিয়াম আছে। একদিন যেমন লোহা ও ইস্পাত ব্রঞ্জ ও ফ্লিণ্টের আধিপত্য কেড়ে নিয়েছিল তেমনি ভবিষ্যতে এলুমিনিয়ম্ লোহা ও ইস্পাতের আধিপত্য না কাড়তে পারলেও অন্যান্য ধাতুর মধ্যে যে সে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।" কেউ বলবেন, "মানুষ অধিকাংশ খাদ্য পেয়ে থাকে গাছপালা থেকে, কিন্তু গাছপালা প্রায়ই তার শর্করাভাগ সহজপাচ্য স্টার্চে পরিণত না ক'রে, করে সেলুলোজে পরিণত। সেলুলোজ হজম হয় না সহজে। পেটের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার চাক থাকার দরুণ মানুষ বেঁচে যায়। আমরা তাই রাসায়নিক উপায়ে সিনথেটিক ফুড তৈরী করার চেষ্টা করছি। মানুষের অধিকাংশ খাবার আরও সরল উপায়ে তৈরী করা যায়, এমন কি, প্রোটিন পর্য্যন্ত। কয়লা এবং নাইট্রোজেন থেকে আমরা খাবার তৈরী করতে পারি। শুধু তাই নয়, এত বড় পৃথিবীর সর্ব্বত্র খাবার ব্যবস্থা করার দরকার হয় না। যে কোন ছোট একটা রাষ্ট্রে বা প্রদেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাবার তৈরী করলে পৃথিবীর লোক তা খেয়ে শেষ করতে পারবে না।" আর একজন বলবেন ঃ "আরে, সুন্দর মানুষ, দীর্ঘজীবী মানুষ তো আমরাই গড়ব ; একেবারে হাতে হাতে ল্যাবোরে-টরীতে, বীক্ষণাগারে।" এমনি অনেক কথা আমাদের শুনতে হবে, যার একটাও মিথ্যে নয়, যা কোন দিন ব্যাদে বা কোরাণে ছিল না, অথচ যা প্রতিদিন আমাদের জীবনের মূল পর্যান্ত নাড়া দিচ্ছে, জীবনের ধারা ও সমাজ-ব্যবস্থাকে দ্রুত এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বিশ্বাস করি আর না-করি, বিজ্ঞানের বিরাম নেই। ...

আমাদের দু-এক পুরুষ পরে যারা আসবে তারা দেখবে তাদের ফুল-বাগানে সিনথেটিক ফুড তৈরী হ'চ্ছে, কসাইখানার জায়গায় উঠেছে খাবার তৈরীর কারখানা। তালুইমা কি জানত যে একদিন তার নাতনীর নাতনী ঐ রেলগাড়ী চালাবে, উড়োজাহাজ চালাবে? বিকলমিঞাও নিশ্চয় ভাবতে পারেনি যে তারই নাতি একদিন প্রশস্ত মাঠের বুকের উপর দিয়ে ট্র্যাক্টর চালিয়ে যাবে, ঘরে বসে রেডিও শুনবে, বিদ্যুতের আলো তার গ্রামের ঘরেই জ্বলবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের সভ্যতাও ঐতিহাসিক যুগ থেকে তো সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে। তাই লেনিন যখন 'সাম্যবাদ' কি? প্রশ্নের উত্তরে এককথায় বলেছিলেন: "Electrification plus the Soviets"—তখন তিনি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান নি, উপরন্তু দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকের মতোই জবাব দিয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হ্যাল্‌ডেনও বলেছেন: "Human progress in historical time has been the progress of cities dragging a reluctant countryside in their wake". ইতিহাসের চমৎকার সার কথা। গররাজি গ্রামাঞ্চলকে টেনেহেঁচড়ে মহানগরী টেনে নিয়ে আসছে তার দিকে—এই তো সভ্যতার ইতিহাস, ঐতিহাসিক যুগের। মহানগরী, নগর, মফঃস্বল শহর, মহকুমা শহর, বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম—এইভাবে এগিয়ে আসছে সমস্ত দেশ, সমস্ত জাত—ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে নৈতিক জীবন, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিমা। বিকলমিঞার নাতি যে-দিন ট্র্যাক্টর চালাবে, রেডিও শুনবে মাঠে বসে, আর মৌচাকের মতো দেশব্যাপী পঞ্চায়েতে তারাই গঠন করবে শাসনতন্ত্র, সেদিন বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান সার্থক হবে।

দেশী বিজ্ঞান = চেতাবনী + রসায়ন

বাংলা দেশের কবি দুঃখ ক'রে বলেছেন :

"মোদের মুক্তি ? আধখানা তার
পীরদরগার এখনো সিন্নি মাঝে
পাদোদক আর তাবিজ মাদুলি শান্তি
স্বস্ত্যয়ন ;
বাকি আধখানা গ্যানোর ফিজিক্স,
চরক-সংহিতায় ।
বিজ্ঞান আর দৈবে মিলিয়া প্রায়
মাঝামাঝি
বিংশ শতাব্দীতে
ঘরে ও বাহিরে অদ্ভুত খেলা খেলিছে
বঙ্গদেশে—"

বঙ্গদেশে 'খেলা' খুবই স্বাভাবিক, কারণ আজও এখানে পূর্বোক্ত উকিল মশাই, আমার তালুইমা ও বিকলমিঞার সংখ্যাই বেশী। বাংলা-দেশে দৈব আর বিজ্ঞানের কোলাকুলি আশ্চর্য্য নয়। রামন ও মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখানে পোকায় কাটবে কাঠের আলমারীতে, হু হু ক'রে বিকোবে লক্ষ লক্ষ কপি "চেতাবনী"। পাদোদক আর তাবিজমাদুলির বড় বড় ব্যারিস্টারেরা বসে আছেন অনেক ফরাসী রাজ্যের আশ্রমে, সুতরাং চেতাবনীরই জয়। তা ছাড়া, বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কৃপায় সম্ভব হয়নি। যতটা তাঁদের শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে প্রয়োজন ততটা উন্নতি সাধন করেই তাঁরা হাত গুটিয়েছেন। দেশীয় ধন-তন্ত্রের বিকাশ হয়নি, ভ্রূণহত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট। ধনপতি বালচাঁদ হীরাচাঁদের মোটরের কারখানা এবং বিমান তৈরীর কারখানা গড়ার প্রয়াসের করুণ পরিণতিই তার প্রমাণ। সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী এবং চিনির কলের ইতিহাস আরও করুণ। আমরা যদি তাই আজও মাদুলি-তাবিজ পরি, চেতাবনী পড়ি, ফুটপাথের ওপর লণ্ঠনের ধারে বসে হাতের তেলোটা বার ক'রে চট্‌ ক'রে বাকি জীবনটা চুম্বকে জেনে নিই, তা হ'লে আমাদের বাপান্ত করা চলে না। জীবনের সামনে আমরা বিজ্ঞানের জয় সদম্ভে ঘোষিত হতে দেখিনি আজও; কলকারখানা আমাদের চারিদিকে মাথা তুলে দাঁড়ায় নি। আজও প্রায় শতকরা আশী জন আমাদের দেশের লোক ঘুরেফিরে চাষ ক'রে খেয়ে বেঁচে থাকে। অবশ্য এটা ঠিক, বৈজ্ঞানিক প্রগতি যতটুকু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে আঘাত করেছে, জীবনকে

বদলেছে ও বদলাচ্ছে, তার পরিচয় আমাদের মনোবৃত্তিতে, শিল্পে ও সাহিত্যে খুব কমই আছে। তা হ'লেও, 'বঙ্গদেশ' বা ভারতবর্ষকে পর্য্যন্ত ক্ষমা করা যায়। কিন্তু পশ্চিমে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সৌধ গড়ে' উঠেছে যেখানে, সেখানেও যখন কনান্‌ডয়েল লক্ষ লক্ষ কপি বিকোয়, প্ল্যানচেট্‌ চলতে থাকে, কোষ্ঠী ও গণৎকারের গবেষণা সম্বলিত পত্রিকা স্টলে ভিড় করে, তখন কৈফিয়ৎ কি? 'Aye, there's the rub ...'

হ্যাম্‌লেটের মতো 'To be or not to be'-সমস্যা আজ বৈজ্ঞানিকের জীবনের সামনে, কারণ রাজত্বটা বৈজ্ঞানিকদের নয়, ধনকুবেরদের। একদিন এই কুবেরদের সিন্দুক ও ব্যাঙ্কের তহবিল ভারি করার জন্যে, সাম্রাজ্য-সম্পত্তি বাড়াবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিকেরা সেদিন আবিষ্কারের আনন্দে, গবেষণার আনন্দে মশগুল্‌ হযেছিলেন। তাঁরা সেদিন দেখেছিলেন তাঁদের সাধনার ফলে বাইরের পৃথিবীতে মানুষের জীবন কি দ্রুত বদলাচ্ছে, সমাজ কি বৈদ্যুতিক গতিতে রূপান্তরিত হ'চ্ছে। সেদিনের বাস্তব সত্য ছিল সৃষ্টি, প্রসার, প্রগতি, আর জীবনের ধ্রুবতারা ছিল ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। কিন্তু আজকের বাস্তব সত্য কি? অপচয় (waste) ও মৃত্যু (death)। শুধু অপচয় ও মৃত্যু নয়। সামগ্রিক যুদ্ধের সঙ্গে সামগ্রিক অপচয (total waste), সামগ্রিক মৃত্যু (total death)। একদিন যে-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনপতি, যখন সেই বিজ্ঞান ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মূর্ত্তি ধরে' তাঁকে ধ্বংস করতে চাইল, তখন তিনি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকেই বন্দী ক'রে বললেন: "যে শক্তি তুমি সৃষ্টি করেছ সে আজ শাণিত বল্লম তুলেছে আমার দিকে—তাকে ধ্বংস

করার জন্যে এবার তুমিই গবেষণা করো।" অর্থাৎ যে শান্তির বাণী, প্রাচুর্য্যের বাণী, বিশ্বমৈত্রীর বাণী বহন ক'রে এনেছে বিজ্ঞান তার দীর্ঘ দিনের দুরূহ সাধনার ফলে তাকে ধ্বংস করার হুকুম এল বিজ্ঞানীর উপর। ডাণ্ডাবেড়ী পরে বৈজ্ঞানিক এগিয়ে গেলেন তাঁর ল্যাবোরেটরীর দিকে—সামনে বোর্ডের উপর লেখা "WAR RESEARCH LABORATORY" ...

মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে শিশু যে দৈত্যের রূপকথা শোনে, সেই দৈত্য যদি দুঃস্বপ্নের ঘোরে তার কপালে চুমু খেয়ে যায়, তা হ'লে শিশু যেমন আতঙ্কে ককিয়ে উঠে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিক তেমনি তাঁর নিজের রচিত রূপকথার দানবকে দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তিনি দেখলেন যে, স্বর্গ থেকে তিনি নির্ব্বাসিত হয়েছেন, শয়তান তাঁর হাত ধরে নিয়ে চলেছে 'ইনফার্ণোর' মধ্যে। চারিদিকে তাঁর আগুন জ্বল্‌ছে, মাথার উপরে, আশেপাশে। শিশুর কাকলি, মানুষের কণ্ঠস্বর কোথাও শোনা যায় না। সবুজ ফসল-ভরা ক্ষেত, সুরম্য অট্টালিকা দেখা যায় না। শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল, নানা দেশের মানুষের কঙ্কালের এক বীভৎস ঐক্যতান আকাশে বাতাসে। ইঞ্জিনীয়ারের ইস্পাত ও কংক্রীটের স্বপ্ন-সৌধ ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিচ্ছে বোমারু বিমান, কেমিস্ট-ফিজিসিস্ট-জিওলজিস্টের আশা ধূলিসাৎ ক'রে দিচ্ছে ইস্পাতের কেটার-পিলার, বায়োলজিস্টদের গৌরব ও সোনালি স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন ক'রে দিচ্ছে মৃত্যুর আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা, আর বাতাসে আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত গ্যাস ও ব্যাক্‌টেরিয়া। আর নরকঙ্কালের কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর অতিরিক্ত রক্তপানে ক্লান্ত ভাইকার্স-স্নাইদার-ক্র্যুজট্‌-ক্রুপস্‌-মিৎসুই-ফোর্ড প্রমুখ ভুড়িয়াল ঘড়িয়ালরা বসে বসে হাঁপ ছাড়ছেন। ...

ধনকুবেরের ক্রীতদাস অন্ধ বৈজ্ঞানিক তাই করজোড়ে প্রকৃতির দিকে ফিরে বললেন : 'ক্ষমা করো অবুঝ শিশুকে! খোদার ওপর খোদকারি করতে গিয়েছিলাম, কঠিন শিক্ষা হয়েছে, আর নয়!' প্রতিপালকের ষড়যন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভুল করলেন প্রকৃতির লীলাখেলা বলে'। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন কৃপণ কুবের। ধর্ম্ম-যাজক ও বৈজ্ঞানিক গলা জড়াজড়ি ক'রে কুবের-রাজের সভায় এলেন বয়স্য সেজে। ফিরে এল পুরাতন এ্যানিমিজম্ (Animism), ম্যাজিক, রিলিজিয়ন। বেঁচে উঠল আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়োর দল; ভূতের ওঝা, গণৎকার ও ত্রিকালজ্ঞ মহা-পুরুষরা। ভগবান যদি নেমে আসেন গণিতের, রসায়নের, পদার্থ বিজ্ঞানের ফরম্যুলা ও গবেষণালব্ধ সত্যের মধ্যে—তা হ'লে দোষ কি আজ আমাদের ঐ প্রবীণ উকিল মশাইয়ের? দোষ কি, আজ পৃথিবীর মেয়েরা যদি ম্যাদাম কুরী হবার স্বপ্ন না দেখে তালুইমা বনে' যায়। কিন্তু কি বিরাট ব্যবধান! টেম্‌স্ নদীর ব্রিজ জখম হ'লে অস্ত্রপতি ও ধনকুবেরদের ভাড়াটে বৈজ্ঞানিকরা চোখে 'সরষের ফুল' দেখেন—যার ইংরেজী নাম 'cosmic ray'—আবার নীপার বাঁধ নিঃসঙ্কোচে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে, স্বপ্ন-শহর স্ট্যালিনগ্রাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রে কোন দেশের বৈজ্ঞানিক লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক হাতে ইস্পাত আর এক হাতে বিদ্যুৎ নিয়ে শপথ করেন : "নরঘাতক ও নরখাদক পিশাচদের এই ধ্বংসাভিযান আমরা চূর্ণ করবই, আমরা বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের যুগযুগান্তের শান্তি ও প্রাচুর্য্যের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেবই।" একেই বলে বৈজ্ঞানিক মনোভাব (scientific spirit)।...

এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ যদি না হয় তা হ'লে এ-যুগের নিষ্ঠুর সত্য নরঘাতীর ষড়যন্ত্রকে কেউ ভাববেন নিয়তির হেঁয়ালি, কেউ

ভাববেন কল্কি অবতারের বোধন, কেউ ভাববেন প্রকৃতির খেয়াল—যার উপর মানুষের হাত নেই। ভুড়িয়াল ঘড়িয়ালরা নিশ্চিন্তে এই ঘোড়ার ডিম 'ভাবনা'য় তা দেবে। ডিম ফুটলে দেখা যাবে বাচ্চা হয়েছে নিয়তির দুলাল হিটলার, প্রকৃতির খেয়ালি ছেলে মুসোলিনী আর কল্কি অবতার তোজো। আজ তাই নিজেরা বাঁচতে হ'লে, সভ্যতাকে বাঁচাতে হ'লে দরকার এই—"scientific spirit." জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক পদে এই বৈজ্ঞানিক মনোভাব। একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সুচিন্তিত দু-একটি কথা এখানে উদ্ধৃত ক'রে শেষ করি:

Just as old machinery becomes obsolete and is scrapped, so false traditions and baseless superstitions must be discarded and eliminated from the social heritage. If education is to fulfil its task, it will require to be permeated with the scientific spirit...(H. Levy).

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা আলস্যে হয়ে বসে না থেকে কবে এই কাজের দায়িত্ব নেবেন? স্বাধীন ভারত, ভাবী ভারতের বনিয়াদ তো আজ তাঁদেরই গড়তে হবে। কিন্তু কোথায় তাঁরা ক্রুসোর দ্বীপে আত্মাভিমানে প্রবাসী, আর কোথায় ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী!

পুরাতন ও নূতন

সাহিত্যের শুভাকাঙ্ক্ষী আমরা সকলেই। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের কথা আমরা সকলেই চিন্তা করি। বাংলাদেশে আজ সাহিত্যিকের সংখ্যা কম নয়, সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সংখ্যাও প্রায় সাহিত্যিক-দেব সমান। কোন গোষ্ঠীর আদর্শ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না ক'রেও একথা নিশ্চয়ই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সকল গোষ্ঠীরই উদ্দেশ্য হ'চ্ছে বাংলা সাহিত্যের সেবা করা এবং বাংলা সাহিত্যকে ভারতীয় সাহিত্যের দরবারে সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। শুধু ভারতীয় সাহিত্যের আসরে কেন, বিশ্বসাহিত্য সভায় আজ বাংলা সাহিত্যের স্থান প্রায়-নির্দ্দিষ্ট। আদর্শ ও উদ্দেশ্য-নির্ব্বিশেষে আমরা সকলেই বাংলা সাহিত্যের পূজারী। কিন্তু আফশোষ হয় তখন যখন দেখি আমরা এই মহৎ উদ্দেশ্য বিসর্জ্জন দিয়ে পারস্পরিক দলাদলিতে আত্মনিয়োগ করেছি এবং

আত্মবিনাশের নিম্নগামী পথ সুগম করতে সকলেই প্রায় আস্তিন্ গুঁটিয়ে কোদাল ধরেছি।...

কোদাল ধরা উচিত ছিল আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ডাস্টবিনে বহু-দিনের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা সাফ করার জন্যে। তা না ক'রে আমরা করেছি কি? অজীর্ণ বিদ্যার কোদাল দিয়ে এদেশ-ওদেশের চতুর্দ্দিকের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা সযত্নে তুলে এনে ভর্ত্তি করেছি আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক আবর্জ্জনাকুণ্ডে। উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জাগৃতির (Renaissance) যুগে বাংলাদেশে রামমোহন, মাইকেল, দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ যে-কাজ করেছিলেন সে-কাজে আমরা অগ্রসর হইনি কেউ। তাঁরা সে যুগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির শাঁসটুকু আত্মসাৎ ক'রে আমাদের মুহ্যমান জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপজাত (degenerate) অংশকে নির্ম্মমভাবে বাতিল করতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে প্রথম সমরোত্তর কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা যা করেছি তার অধিকাংশই অপকর্ম্ম অর্থাৎ ও-দেশের জরাগ্রস্ত স্থবির সাহিত্য ও সংস্কৃতির উচ্ছিষ্ট তুলে এনে জড়ো করেছি এ-দেশে। সমন্বয় ও প্রগতির চেক্‌নাই বুলি আওড়ে ভেজাল দিয়েছি দেশীয় সংস্কৃতিতে ঝানু ব্যবসাদারের মতো। একদিকে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ও উদারপন্থী রাসেল, আর একদিকে ব্যাধিত (morbid) ল্যরেন্স-হাক্সলি, পাউণ্ড-প্রুস্তের সভ্যতার ও যৌনমুক্তির অতিকথা (myth)—এই ছিল আমাদের সম্বল। বিশ্ব-সংস্কৃতির মহাসভা থেকে সেদিন আমরা মণি-মুক্তা আহরণ করতে পারিনি, চেয়ে দেখিনি বিপ্লবমথিত, যুদ্ধপীড়িত ইউরোপের ফ্রাঁস, বার্ব্যুসে, রোলাঁ, ৎস্ভাইগ, ফয়েখ্‌ৎভাঙ্গর, টলার, ব্রেখ্‌ৎ প্রমুখ শিল্পীদের

দিকে, চেয়ে দেখিনি বিপ্লবের রুধিরস্নাত রুশিয়ার নব-সংস্কৃতির বাহক গোর্কির দিকে। আমাদের অবদমিত আত্মা সেদিন গোগ্রাসে গিলেছে বিলেতের জরিষ্ণু সাহিত্য, আর প্রগতির জাগরস্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরা তাই ঢেকুর তুলে উগ্‌রে দিয়েছি দেশবাসীর কাছে। হায় রে প্রগতি! সম্প্রতি সেই মারাত্মক ভুল শোধ্‌রাবার মনোভাব প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে সাহিত্যক্ষেত্রে এক শ্রেণীর নবাগতদের মধ্যে। সশ্রম প্রচেষ্টা চলেছে বিশ্বসংস্কৃতির প্রাণবন্ত আলোকধারার সঙ্গে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের। তাই বলছি, নবাগতরা যেন এক মুহূর্ত্তও না ভুলে যান যে, তাঁরা দুর্গম পথের যাত্রী, তাঁদের সামনে কাল-সাপের বিষাক্ত ফণা, শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।...

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা বংলাদেশে যুগান্তর এনেছিলেন সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে, তাঁরা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন না, জাতীয় সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে আমরা জাতীয় সংস্কৃতির বংশধর না হয়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতালাম সইয়ের-ননদের-বোন্‌পো-বৌএর-বকুল ফুলের-বোন্‌ঝি জামাইয়ের। ফলে 'সত্য-শিব' গড়তে আমরা গড়লাম 'মিথ্যা' ও 'বাঁদর'। এ-ভুল যেন নবাগতরা আর না করেন। প্রগতিশীল সংস্কৃতিই হোক্ আর গণসংস্কৃতিই হোক, কোন সংস্কৃতিই দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে না যদি-না দেশীয় সংস্কৃতির সঞ্জীবনী স্রোতধারায় সে পরিপুষ্ট হয়। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অতীত ইতিহাস আমাদের জানতে হবে, তার সুদীর্ঘ ক্রমবি-কাশের প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি বাঁকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড় করতে হবে। তার ভাববিকাশ (evolution of content) ও রূপ-

বিকাশের (evolution of form) সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্বন্ধ থাকবে, তবেই আমরা সংস্কৃতির মহা-জাগৃতির পথে অগ্রসর হতে পার্‌ব, পা কাঁপবে না, মনও দুলবে না। ...

আমাদের দেশের কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা সাহিত্যিক সশ্রদ্ধভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নেননি। মৌলিকতা জাহির করার দিকেই সকলের আগ্রহ বেশী, কারণ একদিন ভোরে উঠে হঠাৎ বাহ্‌বা তাতেই পাওয়া যায়। এই মহৎ কাজকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছে বাংলাদেশে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানই—'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।' সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই অবশ্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই বিরাট কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে বাংলা সাহিত্যের বংশ-পরিচয় ও জীবনেতিহাস তিনি লিখে গিয়েছেন। সাহিত্যক্ষেত্রের প্রথম হালচাষী তিনি, তাই তাঁর তথ্য-সঞ্চয়ের ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাঁর ঋণ বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের সাহিত্যিক কোনদিন শুধ্‌তে পারবে না। তারপরেই নাম করতে হয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের। ব্রজেন্দ্রবাবুর "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা"র প্রতিটি খণ্ড এক একটি তথ্যের স্তম্ভ। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্বন্ধে খাঁটি ইতিহাস জানতে হ'লে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা" অপরিহার্য্য ও অবশ্য পাঠ্য। ব্রজেন্দ্রবাবু একনিষ্ঠ গবেষক, নিদারুণ শ্রমসাপেক্ষ তথ্যসংগ্রহের মধ্যেই তাঁর অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার জলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় সজনীবাবুর দানও অনস্বীকার্য্য। ব্রজেন্দ্রবাবুর সম্পাদনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ, কৃষ্ণকমল

ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রামরাম বসু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ বাংলা গদ্য ও বাংলা সাহিত্যের সাধকদের চরিতমালা যেমন একদিকে বাংলার সংস্কৃতির অতীত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের পথ সুগম করেছে, তেমনি সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রবাবুর যুগ্ম-সম্পাদনায় বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, ভারতচন্দ্রপ্রমুখ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কর্ণধারদের রচনাবলী নির্ভুল-ভাবে প্রকাশ ক'রে ও প্রকাশ করার ভার নিয়ে বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক কর্ম্মীদেব সংস্কৃতির ইতিহাস অধ্যয়ন ও আলোচনার স্বর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করছে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'। ...

জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিব শ্রীবৃদ্ধি সাধনেব জন্যে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্য্যা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তার জন্যে সবদেশেই আছে 'ন্যাশনাল একাডেমি অফ লিটারেচার' বা 'কাল্‌চার'। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' ভিন্ন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আজ বাংলাদেশে অনুরূপ কাজের ভার নিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। একদিন বাংলাদেশে 'বটতলার' প্রকাশকেরা অজানতে এই মহৎ কাজ করেছিলেন, তা না হ'লে বাংলাদেশেব কত পুঁথি, কত গ্রন্থ নষ্ট হত, কত সাহিত্যিক ও কবি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যেতেন। আজ 'সাহিত্য-পরিষৎ' সেই কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে করছে যোগ্যতর ব্যক্তিদের সহযোগিতায়। এর মূল্য কম নয়। জানি এবং মানি সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস-প্রণয়নের ত্রুটি আছে এবং সে-ত্রুটি হ'চ্ছে অবৈজ্ঞানিক আলোচনার ত্রুটি। কিন্তু প্রত্যক্ষ তথ্যনিষ্ঠা যদি বৈজ্ঞানিকের প্রথম কর্ত্তব্য হয় তা হ'লে সে-কর্ত্তব্য ব্রজেন্দ্রবাবু ও সজনী-কান্ত দাস উভয়েই পালন করেছেন ও করছেন। কথা হ'চ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গীর।

সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণের অভাব তাঁদের গ্রন্থের মধ্যে আছে, কিন্তু আগাগোড়া সমস্ত কাজই তাঁরা শুরু থেকে শেষ করবেন এমন শক্তির গর্ব্ব নিশ্চয়ই তাঁরা করেন না। এমন আকাশের চাঁদ তাঁদের কাছ থেকে দাবী করারও কোন যুক্তি নেই। আসল কথা, আজ আদর্শ সাহিত্যিক কর্ম্মীর অভাব, একনিষ্ঠ সাধকের অভাব। "চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য্য" হয়, এই অসত্য প্রমাণ করার জন্যে আমরা সবাই আজ সাহিত্যের পথে ভিড় ঠেলে গুঁতোগুঁতি ক'রে চলেছি। কোথায়, জানিনে। কোথায় আজ সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যিক কর্ম্মীরা যাঁরা সত্যিই সাহিত্য-পরিষদকে আদর্শ জাতীয় সংস্কৃতি-পরিষদে পরিণত করতে পারেন এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে পারেন? উপাদানের অভাব নেই, তথ্যের অভাব নেই, অভাব কর্ম্মীর, অভাব সততার, অভাব নিষ্ঠার। ...

পরিশেষে, বাংলার তরুণ প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের একটি আবেদন জানিয়ে এই আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানতে চাই। গোড়াতেই বলেছি, আবার বলছি, যে-কোন সংস্কৃতিই হোক, বিপ্লবী সংস্কৃতিই হোক বা গণসংস্কৃতিই হোক, তার জন্যে সবার আগে প্রয়োজন, বিখ্যাত সোভিয়েট শিল্প-সমালোচক আরসেভের (Arosev) ভাষায় 'critical assimilation of the art of past centuries.' কথাটা আমি বিশেষভাবে বলতে চাইছি কম্যুনিস্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের। লেনিন বলেছিলেন, "Without a clear understanding that only by an exact knowledge of the *culture created by the entire evolution of man*, that only by an analysis of it can a proletarian culture

be created." জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্যক্ষেত্রে কিছুদিন আগে প্রগতির নামে যে যৌন-স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রাক্তন বরবাদের আন্দোলন চলেছিল তার কলঙ্কিত দায়িত্ব একশ্রেণীর তথাকথিত সাহিত্য-প্রেমিক কম্যুনিস্টদের স্কন্ধেই চাপাতে চান। কম্যুনিস্ট ও সত্যিকারের প্রগতিশীল লেখকদের আজ প্রমাণ করতে হবে যে, এ-অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন অপবাদ এবং জাতীয় সংস্কৃতির মঙ্গলকামী সাধক যদি কেউ থাকে, তাহ'লে প্রগতিশীল ও কম্যুনিস্ট লেখকরাই আছে। বিকৃত ও বিভ্রান্ত প্রগতির শিবিরে ঘুরপাক না খেয়ে জাতীয় সংস্কৃতির খাঁটি শিবিরের (হোক্ সে সনাতন বা পুরাতন) সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন করা উচিত। উচিত মনে হয় বলেই পূর্ব্বোক্ত আলোচনা বিশেষভাবে প্রণিধেয়।

সাংবাদিক সাহিত্য

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রতি সপ্তাহে অবসর-দিনে, অর্থাৎ রবিবারে যে সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র বা 'সাময়িকী' প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলবো। আমরা এ-দেশে সাংবাদিকতা শিখেছি বিদেশী ইংরেজদের কাছ থেকে, এ-কথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করেন না। তেমনি 'সাময়িকী' আমদানি হয়েছে বিদেশ থেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বৈদেশিক সংবাদপত্রেও এর কোন চিহ্ন ছিল না। তখন কোন শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে বা পড়তে হ'লে পাঠকদের নির্ভর করতে হত 'মাসিক' বা 'ত্রৈমাসিক' পত্রিকার উপর। সেকালে ইংলণ্ডের '*Nineteenth Century,*' '*Contemporary*', '*Fortnightly*' মাসিক এবং '*Edinburgh*' ও '*Quarterly*' প্রভৃতি ত্রৈমাসিক পত্রিকার যে রকম প্রচুর সংখ্যায় কাট্‌তি হত তা বোধ

হয় আজকালকার কোন মাসিক বা ত্রৈমাসিকের পরিচালক কল্পনাই করতে পারেন না। কিন্তু এই সব পত্রিকার মূল্য খুব বেশি হওয়ার দরুণ ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকলেও সব পাঠকের পক্ষে কিনে পড়া সম্ভব হত না। দৈনন্দিন সংবাদ ছাড়াও বহু পাঠক যে আরও কিছু এই দুনিয়া সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, এ-বিষয় প্রথমে উপলব্ধি করেন বিখ্যাত সাংবাদিক ডব্লু. টি. স্টেড (W. T. Stead)। তিনি তাই সব পত্রিকা থেকে উৎকৃষ্ট রচনা আহরণ ক'রে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন, ছ' পেনি তার দাম। অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা হ'ল ৮৮,০০০। পত্রিকাটির নাম '*Review of Reviews*'। ···

পাঠকদের এই তাগিদ ও অভাব ক্রমে ক্রমে দৈনিক সংবাদপত্রের পরিচালক ও সম্পাদকেরাও বুঝতে আরম্ভ করেন এবং এই অভাব মেটাবার জন্যেই প্রাত্যহিক সাংবাদিকতার মধ্যেও 'features'-এর প্রবর্ত্তন করা হয়। তাতে সুবিধা হয় কি? প্রথমত, যেসব লেখার জন্যে বা যেসব বিষয়ে আলোচনার জন্যে পাঠকদের একমাস কি তিনমাস অপেক্ষা করতে হত, দৈনিক পত্রিকায় 'features' প্রবর্ত্তিত হবার ফলে পাঠকদের আর সেরকম দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত, লেখকেরাও যে-বিষয় পাঠকদের নজরে তাড়াতাড়ি আনতে চান বা প্রকাশ করতে চান, এখানে সেই প্রকাশের সুবিধাও তাঁরা পেলেন। উপকৃত হলেন পাঠকেরা, সাংবাদিকতাও উন্নীত হ'ল এক ধাপ। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মধ্যে একটা রফা হ'ল, যে রফা রীতিমত যুগোপযোগী। হু হু ক'রে দৈনিকগুলোর পাঠক-সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মাসিক, ত্রৈমাসিক, এমন কি সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোও

সুযোগ পেল গভীরতর বিষয় নিয়ে আলোচনার এবং সুদীর্ঘ আলোচনা-সাপেক্ষ রচনা প্রকাশের। এই 'features' প্রবর্ত্তিত হবার অনেক পরে নিয়মিতভাবে দৈনিক পত্রিকাতে সাপ্তাহিক 'magazine' প্রকাশিত হতে থাকে, প্রধানত আমেরিকা থেকে। পরে ইংলণ্ডে ও য়ুরোপে এবং তারও বহু পরে অন্যান্য দেশে (আমাদের দেশেও) এই সাপ্তাহিক 'সাময়িকী' প্রকাশিত হয়। ···

অনেকে বলেন, দৈনিক পত্রিকায় এই 'ম্যাগাজিনে' চুটকি ব্যাপারের হাল্‌কা আলোচনাই ভাল। যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা বলেন যে, সারা সপ্তাহ খেটে খেটে পাঠকদের মন তিতবিরক্ত হয়ে থাকে, স্নায়ুগুলো কট্‌কট্‌ করতে থাকে, অতএব তাঁদের একটু প্রসন্ন করা দরকার এবং স্নায়ুগুলো সপ্তাহান্তে যাতে একটু আল্‌গা হতে পারে সেই রকম হাল্‌কা আলোচনা প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু এ-যুক্তির নব্বুই ভাগ মিথ্যে এবং দশ ভাগ সত্যি, অন্তত পৃথিবীর বিশিষ্ট সাংবাদিক, এমন কি, সংবাদপত্রের মালিকদেরও তাই মত। হাল্‌কা বা হাসির বিষয় কিছু থাকা দরকার, একশ'বার দরকার, পাঠক ক্লান্ত কেরাণী, উকিল বা ডেপুটী বলে' নয়, পাঠক 'মানুষ' বলে'। মানুষ মাত্রেই হাসতে চায়—সেই জন্যে দরকার। কিন্তু আসলে অধিকাংশ পাঠক উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন কি জন্যে ? প্রতিদিনের কোলাহল ও কর্ম্মমুখরতার মধ্যে তাঁরা অবসর পান না দুনিয়ার হালচাল ভাল ক'রে জানার। অবসর দিনে তাঁরা কিছু জান্‌তে চান, শিখতে চান, ভাল ক'রে, বিস্তারিতভাবে, কারণ ঐ একটা দিনই তাঁদের পুরো ছুটি। দুনিয়ার বুকের ওপর রোজ যা ঘটছে, পৃথিবী রোজ সাহিত্যে, শিল্পে,

বিজ্ঞানে, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে—যেদিকে যেভাবে এগিয়ে চলেছে এবং যার চুটকি খবর তাঁরা দৈনিক সংবাদের মধ্যে পান, তারই একটু বিস্তৃত পরিচয়, ব্যাখ্যা ও আলোচনা তাঁরা পেতে চান অবসর দিনে। তার সঙ্গে একটু হাসতে চাইবেন বৈ কি! কিন্তু তাই ব'লে সপ্তাহান্তে রবিবারের সংবাদপত্র হঠাৎ এক মূর্ত্তিমান গোপালভাঁড়ের মতো বাড়ীতে এল এবং সারা দুপুর ও রাত দশটা পর্য্যন্ত কেবল হাসিয়ে পেটে খিল্ লাগিয়ে দিলে, এ নিশ্চয়ই কোন সুস্থ পাঠক নেহাৎ মানুষ বলেই চাইবেন না। তা যদি চাইতেন তা হ'লে বাজারে শুধু '*Punch*' ও 'অবতার'-ই চলতো আর কিছু চলতো না। কেবল খিল্ খিল্ ক'রে হাসি আর কাতুকুতু অন্য ব্যাপার, অন্য শ্রেণীর পত্রিকার জন্যে, কোন সম্ভ্রান্ত দৈনিকের জন্যে কখনই নয়। *The Times*, *Daily Mail* বা *Daily Telegraph*-এর মতো দৈনিকের জন্যে নয়, সেই শ্রেণীর পাঠকদের জন্যেও নয়, যাঁদের মতামত ও কথা নিয়েই হয় public opinion এবং যে public opinion তৈরী করার, পরিচালনা করার দায়িত্ব সম্ভ্রান্ত দৈনিকের। বিখ্যাত সাংবাদিক উইথাম স্টীড্ ('দি টাইমস' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) তাই আক্ষেপ ক'রে বলেছেন: "... Public appetite for sound information can be under-estimated by journalists of newspaper proprietors who trade upon what they imagine to be the public liking for vulgar trivialities. The day may come when a newspaper-maker of genius will understand how wide the field already is for journalism of a better sort

and will cultivate it through a popular daily paper ..." (W. Steed : *The Press*)

এখানে বিজ্ঞাপনদাতাদের কথাও এসে পড়ে। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক সময় পত্রিকার "net sales certificates" দেখে প্রলুব্ধ হন, মনে করেন বুঝি সেই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিলেই তাঁদের জিনিষের হু হু ক'রে চাহিদা বাড়বে। কিন্তু এখানে একটা বিষয় বিজ্ঞাপনদাতাদেরও বিশেষভাবে ভেবে দেখা উচিত, কারণ তাঁদের উপরেই দৈনিক পত্রিকার অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং সম্ভ্রান্ত দৈনিক পত্রিকার সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখতে তাঁরাই পারেন। তা না হ'লে অনেক সময় পত্রিকাধ্যক্ষ বা সম্পাদকের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাগজকে সস্তায় 'পপুলার' করতে হয় বিজ্ঞাপনদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। পত্রিকার দু'রকম 'সার্কুলেশন' আছে, এক রকম 'quantity circulation', আর এক রকম 'quality circulation.' ভাল পত্রিকা অনেক বেশী লোকের হাতে ও মনে ঘোরে, নিম্নশ্রেণীর কাগজের সংখ্যাধিক্য তার কাছে কিছুই নয়। যেমন '*The Times*' পত্রিকা এবং বিলাতের অন্যান্য পত্রিকা। স্টীড্ সাহেব বলেছেন: "The higher class newspapers, whose actual sales may be barely a tenth of those claimed by the biggest 'popular' journals, probably pass through many more hands than do the 'popular' sheets. A single copy of '*The Times*', for instanee, is likely to be read or seen by many more people than a single copy of the '*Daily Mail*' or the '*Daily Express.*' '*The*

Times' has therefore a 'quality' circulation both numerically and intellectually." (*Ibid.*) এ-কথাটা বিজ্ঞাপনদাতাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত, বিশেষ ক'রে যাঁরা ভাল জিনিষের বিজ্ঞাপন ভাল ক'রে দিতে চান। ...

আধুনিক যুগে সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্রের 'quality' সার্কুলেশন নির্ভর করে কোন পক্ষপাতিত্ব না ক'রে 'news' সরবরাহ করার উপর, বিশেষ ক'রে 'sound news'—ভাল সম্পাদকীয় আলোচনার উপর এবং তার সঙ্গে উঁচু শ্রেণীর সাপ্তাহিক 'ম্যাগাজিনের' উপর। যে-পত্রিকা যত বেশী 'news' নিরপেক্ষভাবে পাঠকদের সরবরাহ করতে পারবে, যে-পত্রিকার 'সম্পাদকীয়'তে যত বেশী দৈনন্দিন ঘটনার জটিলতা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হবে, যে-পত্রিকার সাপ্তাহিক 'সাময়িকী' যত বেশী উন্নত ও সঞ্চয়যোগ্য বা 'cutting' রাখবার যোগ্য হবে, সেই পত্রিকার 'quality' সার্কুলেশন তত বেশী বাড়বে এবং সামাজিক বিচারে সেই পত্রিকার 'popularity'-রও দাবী থাকবে তত বেশী। গড্ডালিকা প্রবাহে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার চেষ্টার শেষ পরিণতি সুনিশ্চিত ব্যর্থতা।

জীর্ণ, পুরাতান যাক্, ভেসে যাক্

ইস্পাত দিয়ে তৈরী নয় মানুষের সমাজ। তবে একেবারে মাটি দিয়েও গড়া নয় যে একটু ঝড়-জলে ভেঙ্গে যাবে। বরং বলা চলে রি-ইন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের তৈরী, জাপানী বোমার ঘা লেগে তার কিছুই হবে না, বড় জোর একটু চিড় খাবে, না-হয় গর্ত্ত হয়ে যাবে। তাকে ভাঙতে হ'লে প্রয়োজন শত শত পাউণ্ড ওজনের বোমা। কথা হ'চ্ছে, সমাজও

ভাঙে, ভাঙতে তাকে হবেই, হয়ও। এক একটা যুগ যখন বাঁক ফেরে, বিপ্লবের মঞ্জীর বেঁধে পায়ে ইতিহাস যখন নৃত্য শুরু করে, তখনই পড়তে থাকে টন টন বোমা কংক্রীটের দেয়াল ও ছাদের উপর। সমাজ ভেঙে যায়, একেবারে চুরমার হয়ে মিশে যায় ধূলোর সঙ্গে। কিন্তু ইতিহাস শুধু নটরাজ বা বাঈজী নয়, প্রলয়-নাচন নেচেই তার মুক্তি নেই। ইতিহাস সুদক্ষ স্থপতিও (Architect), আবার নতুন পরিকল্পনায় তাকে গড়ে তোলে। এই হ'ল ইতিহাস, চিরপরিবর্ত্তনশীল মানুষের সমাজের এই হ'ল গতিভঙ্গী।…

আজকের যুগসন্ধিক্ষণেও তাই মানুষের সমাজ ভাঙনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। টন টন বোমা আর শেলের আঘাতে শুধু মেঘচুম্বি হর্ম্ম্যমালাই হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ছে না, শুধু গির্জ্জার ও মন্দিরের চূড়াই যে ভেঙে পড়ছে তা নয়, পর্ণ কুটীরই শুধু পুড়ে পুড়ে ছাই হ'চ্ছে না। তার সঙ্গে কক্ষচ্যুত হ'চ্ছে হর্ম্ম্যবাসীরা, দেবতার আসন টলমল ক'রে উঠছে, আর 'ছায়াসুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র মানুষের বেড়াবন্দী শান্তিপ্রিয় জীবন প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে আইঢাই করছে। সারা পৃথিবীব্যাপী আজ এই ভাঙনের পালা শুরু হয়েছে মহাযুদ্ধের মহাসঙ্কটের মধ্যে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, পদানত ইউরোপ, মহাচীন, এমন কি, আমাদের ভারতবর্ষও এই সঙ্কট এড়াতে পারেনি। মহাযুদ্ধের বিভীষিকা ও আর্ত্তনাদের অন্তরালে চলেছে সমাজের জীর্ণ পাঁজরের উপর নিষ্ঠুর ইতিহাসের নির্ম্মম কুঠারাঘাত। জীর্ণ পাঁজর খসে পড়ছে, চারিদিকে ঘুণধরা দেয়াল ভেঙে পড়ছে। আজ এমনই এক অবস্থা যখন রবীন্দ্রনাথের সেই 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানের কথা মনে পড়ে—

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যা উদ্দাম কৌতুক
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক
আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনের ডাক। ···

চীনের কথাই ধরা যাক্, কারণ ঘরের পাশেই চীন। তা ছাড়া, সভ্যতার ঐতিহ্য ও সামাজিক অবস্থার দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষ ও চীনকে সহোদর ভাই বলা চলে। ক্ষিপ্ত গণ্ডারের মতো আরণ্যক হিংস্রতায় নিপ্পনী সাম্রাজ্যবাদ আজ ছ' বছর ধরে চীনের মাটি ও মানুষ দলেপিষে ফুড়ে চলেছে। এই ছ' বছরে চীন শান্তির আস্বাদ পায়নি, কিন্তু শ্রান্তির অবসাদ তার রক্তাক্ত দেহের কোথাও নেই। মাঝে মাঝে চুংকিং থেকে তিব্বৎ ও ব্রহ্মদেশের মাথার উপরের কৃষ্ণমেঘ চিরে এ-দেশে ভেসে আসে চীনের আহত ও মুমূর্ষু নর-নারী-শিশুর করুণ আর্ত্তনাদ, হোপাই ও হোনান থেকে মেঘদূত আসে সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের মর্ম্মান্তিক বারতা নিয়ে। কনফুসিয়াসের (Confucius) ঘরোয়া দর্শনের ঘুম পাড়ানি দোলায় লালিত চীনের নরনারী আজ ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া। চীনের আদিম পরিবারের (clan family) গোরস্থান আজ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখা। একান্ত স্বার্থপর শান্তিকামী গৃহস্থের জীবন আজ সঙ্কটের শতমুখী আক্রমণে ছত্রভঙ্গ। শুধু ছত্রভঙ্গ নয়, জীবনের

তাগিদে, আত্মরক্ষার তাগিদে, আজ ছোট ছোট আদিম পরিবারের চোরকুঠুরীতে বন্দী চীন মুক্ত ও মুক্তিকামী চীনের বৃহত্তম সমাজের ছায়াতলে আশ্রয়প্রার্থী। জাতীয় সঙ্কট আজ চীনের ব্যষ্টিকেন্দ্রিক জীবনকে করেছে সমষ্টি-কাতর। চৈনিক সমাজের বহু পুরাতন দেয়াল আজ এমনি ক'রেই ভাঙছে, এমনি করেই কনফুসিয়াস বিংশ শতাব্দীর চীনের জীবনের মহাযাজ্ঞিক অনুষ্ঠান থেকে অপসৃত হচ্ছেন। 'মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবিত অবস্থায় বাপমায়ের সেবা করা, মৃত্যুর পর তাঁদের সশ্রদ্ধভাবে গোর দেওয়া, তারপর গোর দেওয়ার পর তাঁদের পুণ্য স্মৃতিপূজা করা'—এই বহু পুরাতন কনফুসিয়ান্ লোকপ্রবাদ আজ লোকান্তরিত। সেই আফিংখোর চীনের কিশোর-কিশোরীকে যদি আজ বলা যায়, 'তোমার সেবা প্রথম প্রাপ্য কার?' তা হ'লে তারা নিঃসংশয়ে মাথা তুলে বলবে 'চীনের', পরিবারের নয়। কত শত্রুকবলিত প্রদেশ ও গ্রাম থেকে চীনের কত যুবক-যুবতী হয়ত সারা জীবনের মতোই গৃহত্যাগী হয়েছে (বৈরাগী নয়), তবুও পূজনীয় বাপ-মায়ের জাপানী বশ্যতা স্বীকারের কাকুতিতে কর্ণপাত করতে তারা পারে নি। কনফুসিয়াসের লালেবাই-লালিত চীনের পরিবার আজ তাই বিকলাঙ্গ, খণ্ড-বিখণ্ড, চূর্ণ-বিচূর্ণ। শুধু তাই নয়, এই ভাঙনের পাশাপাশি চলেছে অনিবার্য্য গঠন। এও ইতিহাস। বহুভাষী চীনের জনসাধারণ চলেছে এক প্রদেশ ছেড়ে আর এক প্রদেশে, যেখানকার ভাব ভাষা ও আচার ব্যবহারের সঙ্গে তাদের কোনই পরিচয় নেই। জল-বাতাসের ট্যাবু (taboo) অথবা গ্রামের টোটেমের (totem) কৃপায় এতদিন এসব ছিল তাদের কাছে বিদেশ বিভুঁই, সেখানে যাত্রা নিষেধ।

আজ সেই নিষিদ্ধের (taboo) চীন-প্রাচীরের চিতাশয্যা রচনা করেছে ধূলায় অগ্নিবোমা। তাই দেখা যায়, হয়ত সেন্সীর কোন রেস্তোরাঁয় চা-পান করছে একসঙ্গে এক ডজন প্রদেশের বারভাষীরা, য়ুনানের কোন তাঁত-শালায় তাঁতবোনা শেখাচ্ছে সাংহাইয়ের মেয়ে, মাঞ্চুরিয়ার পলাতক অধিবাসীরা হোনানের সৈনিকদের জন্যে তৈরী করছে ব্যাণ্ডেজ ও ইউনিফর্ম, শাণ্টুং-এর আটাজীবী কৃষকেরা দলবদ্ধ করছে হুনানের অন্নজীবী কৃষকদের, আবার ক্যাণ্টনের কোন খোঁড়া সৈনিক বিবাহ করছে নান্‌কিং এর কোন সদ্য বিধবাকে। এমনি ক'রে চীনের পুরাতন বাঁধরুদ্ধ সমাজের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, আর তার বাঁধমুক্ত জোয়ার এ-কূল ও-কূল, এ-গ্রাম সে-গ্রাম—একাকার ক'রে দিচ্ছে। মনের মানা, শাস্ত্রের বাধা কিছুই মানছে না। ...

চীনের বহু মধ্যবিত্ত পরিবার নেমে এসেছে বিত্তহীন শ্রমজীবীদের (proletariat) স্তরে। শিক্ষক, সৈনিক, ছাত্র, শ্রমিক এক জায়গায় একই অবস্থায় সমান আয় করছে, পাশাপাশি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। রক্ষণশীলতা আজ চীনের জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই অশ্লীলতারই নামান্তর। সমান সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, সমান আশা-নিরাশা ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সব অভিমান, সব অহঙ্কারকে ষ্টীমরোলারে পিষে সমতল ক'রে দিচ্ছে। মহাসঙ্কটের জলন্ত চুল্লীতে আজ জীবনের সব অসমতা সমতল হয়ে যাচ্ছে, সব শুচিবায়ুতা সমবায় জীবনের সংস্পর্শে অন্তর্দ্ধান করছে কর্পূরের মতো। ...

ধর্ম্মেরও নিষ্কৃতি নেই। মৃত্যুর মুখোমুখী পরিচয়ের পর ধর্ম্মভীরু, সংস্কার-অন্ধ চীনের জনসাধারণের সামনে আজ বিরাট প্রশ্ন। চারিদিকে

বুদ্ধ ও তাওয়ের মন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত। কোথাও বা এই মন্দির হয়েছে শত্রুর গণিকালয়, আবার কোথাও হয়েছে চীনা গেরিলাদের গোপন ঘাঁটি, অস্ত্রতৈরীর ছদ্মবেশী কারখানা। তারপর চীনের শুভাকাঙ্ক্ষী জাপানী সৈনিকেরা যখন—

"গর্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন
গ্রামপল্লীর র'বে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ,
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।—"

—তখন আফিংখোর জড়ভরত চীনেরও নেশার ঘোর কেটে যায়। মনে হয় ধর্ম্মই আফিং। বুদ্ধের মন্দিরে বিশ্বাসের অগ্নি-আখরে যখন লেখা হয় "দেবতা" তখনই মিংসুই-মিংসুবিসির পুষ্পকরথ আকাশ থেকে তার উপর বহ্নি-আঘাত হেনে লিখে দেয়—"নাই"। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বাণী তখন চীনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে কি, যখন 'উৎকট দর্শন' জাপানীরা দাঁতে দাঁত ঘসে হিংসার উষ্মায় অধীর হয়ে সিদ্ধির বর চাইতে স্পর্দ্ধায় চলে বুদ্ধের মন্দির তলে? ...

এমনি করেই ভেঙেছে আমাদের ভারতীয় সমাজ, আমাদের বাংলা-দেশের সমাজ, বাংলার ঘর। প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আস্বাদ বলতে যদিও আমরা মাত্র পেয়েছি মোট কয়েক টন জাপানী বোমা, তা হ'লেও সামগ্রিক যুদ্ধ

কড়ায়গণ্ডায় সুদে-আসলে তার পাওনা আদায় ক'রে নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। বাংলার মাটি, বাংলার বায়ু, বাংলার আকাশ, বাংলার জল, বাংলার মানুষ, বাংলার সমাজ আজ সেই বিরাট পরিবর্ত্তন ও আবর্ত্তনের মুখে দাঁড়িয়ে। বাংলার বাঁধ ভেঙেছে।

অযান্ত্রিক

এ-পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁরা যন্ত্রের নাম শুনলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁদের মানুষিক সত্তা নাকি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অতনু আত্মার অণিমা নাকি যন্ত্রের রূঢ় ঘর্ষণে ম্লান হয়ে যায়। মানুষের মনের মুক্তপক্ষ গতিকে যন্ত্র রুদ্ধ করে। চির-উড্ডীয়মান আত্মার গতিপথ যন্ত্রের ও কারখানার চিম্‌নি-উদ্গারিত ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। ডানা-কাটা পাখির মতো ঊর্দ্ধ-লোক থেকে পড়ে সোঁদাগন্ধ মাটির বুকে। তারপর রিপু-সর্ব্বস্ব মাটির চলে অবিরাম আক্রমণ। কোমল আত্মা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আত্মসমর্পণ করে মাটির কাছে। নানা রিপু—লোভ, ক্রোধ, কাম, প্রভৃতির দংশনে জর্জ্জরিত আত্মা মাটির মোটা পোষাক পরে' হয় মাটি-প্রবণ বা জড়ধর্ম্মী। সুন্দর, সত্য ও মানবিকতার বোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়; লোভের অনুচরবর্গ—হিংসা, জিঘাংসা একে একে তাদের

আধিপত্য কায়েম ক'রে নেয়। শান্তি হয় জীবন ও পৃথিবী থেকে নির্ব্বাসিত। এই তো যন্ত্রের দান।

সুতরাং আধ্যাত্মিক শুভাকাঙ্খীরা মানুষের কল্যাণ কামনা করেন যন্ত্রকে বর্জ্জন ক'রে, যন্ত্রযুগকে জাহান্নমে পাঠিয়ে। হয়ত এই বাণী কেউ বেতারে প্রচার করেন, কেউ সংবাদপত্রে, কেউ পুস্তকের মধ্য দিয়ে। বেতার, সংবাদপত্র ও প্রেসে তখন প্রাণহীন যন্ত্রগুলি বিদ্রূপের অট্টহাসি হাসে। টাইপ্-রাইটার থেকে মাইক্রোফোন্, টেলি-প্রিন্টার, লাইনো-রোটারি পর্যান্ত সকলে মুখ-চাওয়াচায়ি ক'রে মুচকি হেসে বলে: 'সেকেলে গুরুদের মতো পৃথিবী-ব্যাপী টোল ক'রে শিষ্যদের সরাসরি বাণী শোনালেই হয়, আমাদের সেবাযত্নের প্রয়োজনটা কি? যে ভৃত্যের সেবা-শুশ্রূষার ওপর জীবন নির্ভর করে, কোন বুদ্ধিমান মনিব তার কুৎসা রটনা করে না। গাড়োয়ান আর মাঝিমাল্লা নিয়ে স্থলেজলে ভ্রমণ করলেই হয়, স্টীমার, জাহাজ, মোটর-লঞ্চ, ট্রেন—এসবের কি প্রয়োজন? স্টীলরথে শূন্যে ওড়ার সখ কেন, পুষ্পকরথ সন্ধান করলেই হয়। সকালের রুটি-মাখন থেকে পরনের পোষাকটি পর্য্যন্ত সবই তো যন্ত্রের দান। তাদের গ্রহণ না ক'রে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখলেই হয়, কদিনের জন্যে ক'জনের জীবনকে আহারে-বিহারে স্বচ্ছল করা যায়। বৈদ্যুতিক শক্তিকে বর্জ্জন ক'রে প্রদীপ আর কাষ্ঠাগ্নির সাহায্যে, ট্রাম, বাস, মোটর, টিউব ট্রেন, পম্পিং স্টেশন্, কলকারখানা চালালেই হয়, বা তাদের শক্তি সরবরাহ করলেই হয়। কেমিস্ট, ডাক্তার বা সার্জ্জনদের মানুষ ও জীবনের শত্রু ব'লে বধ ক'রে একবার বনজঙ্গলের গাছ ও ভূত-প্রেত-ডাইনীদের নিয়ে কয়েকটা দিন জীবনের কাটালেই হয়। তা হ'লে অভাব দূর হয়ে, শান্তি

ফিরে আসবে, প্রাচুর্য্যের ক্রোড়শায়ী নরদেহ অনর্থক আর আত্মাকে মাটির নরকের দিকে টেনে নামাবে না ; যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্যে আত্মা সূক্ষ্মতম রূপ পরিগ্রহ ক'রে বিরাট বিশ্বমানবতায় বিলীন হয়ে যাবে।

আর এক সম্প্রদায়ের সমাজ-হিতৈষী আছেন যাঁরা বলেন, একটি কারখানায় একটি মেশিন হযত একহাজার শ্রমিকের কাজ করে, সুতরাং একহাজার শ্রমিককে বেকার ক'রে তবে যন্ত্র তার কাজ করে। যন্ত্রের এ-সমস্যার সমাধান কোথায় ? আর প্রাচুর্য্যই যদি যন্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে যন্ত্র-সভ্যতায় যেদেশ উন্নতির সৌধশিখরে উঠেছে সেখানে অভাবের তাড়না এত কেন ? কেন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার থাকে, কেন সেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আধ-পেটা খেয়ে থাকে ? সুতরাং এই শ্রেণীর সমাজহিতৈষীর সিদ্ধান্ত হ'ল, যন্ত্রই যত অনিষ্টের মূল, যন্ত্র ধ্বংস করলেই এ সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু সমস্যাটা কি তাই ? যন্ত্রের যেদিন আবির্ভাব হ'ল এই পৃথিবীতে সেদিন তো মানুষের জীবনে বৈষম্য ও দৈন্যের সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তীরধনুক, পাথর ব্রঞ্জ আর লোহার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যে-মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের জীবনের স্বচ্ছলতার জন্যে সংগ্রামে বিব্রত ছিল, সেই মানুষই যখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে যন্ত্রযুগের শৈশবে পদার্পণ করল তখন তার সংগ্রামের অস্ত্রই তো শাণিত হ'ল অনেক বেশী। অর্থাৎ জীবিকা-উৎপাদনের হাতিয়ার আরও বলিষ্ঠ হ'ল। সুতরাং জীবনে তো মসৃণতা আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা আসেনি কেন ? যন্ত্রের উপর সকল মানুষের সমান অধিকার রইল না। একটি শ্রেণীর মানুষই মালিক হ'ল যন্ত্রের, বাকি সকলে হ'ল যন্ত্রের দাস। যারা মালিক হ'ল, যারা যন্ত্র

আর কারখানা দখল ক'রে উৎপাদন (production) নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তা হ'ল, তাদেরই আমরা বলি ধনিকশ্রেণী, আর যারা যন্ত্রের দাস হয়ে জীবিকার জন্যে শ্রম করা আরম্ভ করল তারাই সর্ব্ব-অধিকার-বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণী। যন্ত্রযুগের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এই যন্ত্রের মালিকানা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সঙ্কীর্ণ হ'ল। অর্থাৎ যন্ত্রের মালিকানা সঙ্কুচিত হয়ে এক একটি মালিকের আধিপত্যের বিস্তার হ'ল। ছোট ছোট মালিকদের প্রতিযোগিতায় আত্মসাৎ ক'রে এলেন একজন ফোর্ড, একজন রকফেলার, একজন ভাইকার, একজন ক্রুপ, একজন জাহারফ, একজন টাটা, একজন বালচাঁদ হীরাচাঁদ। আর একদিকে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হ'ল, এবং তাদের অবস্থাও শোচনীয় হ'ল। যন্ত্রের প্রসার ও প্রগতি এই ক্ষুদ্র ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থের সীমানা ডিঙিয়ে গেল না। তাই যন্ত্র হ'ল দানবীয — মানবীয নয়।

কিন্তু মানুষ অনেক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। কেউ মাটি কাটে, কেউ কয়লার পিঠে কামড় দেয়, কেউ নদীর তলা চুষে আনে, কেউ বোঝা তোলে আর নামায়। কারও দাঁত আছে, কারও শুঁড় আছে, কারও আছে শক্ত হাত-পা। কেউ দাঁত কিড়মিড় করে, কেউ শুষে নেয়, কেউ ঘন ঘন ঘা মারে। কারও নাম 'excavation', কেউ 'crane', কেউ 'drill', কেউ-বা 'hydraulic hewer'. কেউ বশ করেছে দুর্দ্দান্ত পবনদেবতাকে, তাই দেখি 'aero-hydraulic' স্টেশনে windmill-গুলি কোথাও যন্ত্র চালাচ্ছে, কোথাও মাটির তলা থেকে তেল পাম্প ক'রে তুলছে। এরা সব গোর্কির ভাষায় 'steel pilgrims', ইস্পাতের তীর্থযাত্রী—"Over an infinite expanse of oil fields crouch iron

pumps with clanking chains ; the great watch-towers of the past are disappearing ; everywhere swing the clumsy 'pilgrims.' Almost noiselessly they pump the oil from the depths of the earth." স্থল, জল, শূন্য শোষণ ক'রে আজ বৈদ্যুতিক শক্তি মানুষের প্রাচুর্য্যের ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে অবিরাম সংগ্রাম করছে। মাঠে ও কারখানায় যন্ত্র চলছে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে, ইস্পাতের রেলের উপর দিয়ে ট্রেন চলছে বিদ্যুতে, বিদ্যুতের লাঙল মাটি চষছে, বিদ্যুতের মোটরে শ্রমিকেরা চলেছে কারখানায়। ঘরে, পথে, কারখানায়, মাঠে, নদীতে, শূন্যে—সর্ব্বত্র শক্তিমান্ বিদ্যুতের ভৃত্যেরা নীরবে কাজ করছে মানুষের জন্যে—অথচ মানুষের দাসত্বের ও দৈন্যের অভিযোগ কেন তীব্রতর হ'চ্ছে ক্রমে ?

কারণ পূর্ব্বোক্ত ধনিকগোষ্ঠীর কাছে বিজ্ঞান ক্রীতদাস, তাই সৌম্য-মূর্ত্তির অন্তরালে বৈজ্ঞানিক আজ খুনী। যন্ত্র আজ বন্দী, শৃঙ্খলিত, তাই যন্ত্রের ক্রীতদাস মানুষ, যন্ত্র মানুষের দাস নয়। প্রাচুর্য্যের মধ্যে আজ তাই দৈন্য, সভ্যতার ঊর্দ্ধচূড়ায় আজ তাই বর্ব্বর যুগের নিরন্ধ্র অন্ধকার।

যন্ত্র যদি মুষ্টিমেয় অর্থপিশাচের ভোগলালসার ইন্ধন না জুগিয়ে, শ্রেণী ও গোষ্ঠীনির্ব্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্যে নিয়োজিত হয় তা হ'লে প্রাচুর্য্য ও শান্তি মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হবে। যন্ত্রের যূপ-কাষ্ঠে আজ লাখে লাখে যারা উৎসর্গীত হ'চ্ছে এই ভার তাদেরই নিতে হবে। সামাজিক বিপ্লবের আবর্ত্তে এই শ্রেণীবাঁধ ভেঙে দিতে হবে, তা হ'লেই ক্রুপ্‌স্, ভাইকার্স, স্কোডা, মিৎসুই, বেৎলেহেম স্টীল কর্পোরেশন প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রোৎপাদনের কসাইখানায় আমরা যন্ত্রের ও

বৈজ্ঞানিকের বীভৎস জল্লাদ-মূর্তি আর দেখব না, যে-মূর্তি সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার,—তার পরিবর্তে দেখব শত শত নিপ্রোস্ট্রয় (যদিও একটি-মাত্র, তাও আজ নাৎসীদের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে), হাজার হাজার হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক ও এ্যারো-হাইড্রলিক্ ইনস্টিটিউট্, অযুত স্টীম টারবাইন্, লক্ষ লক্ষ ট্র্যাক্টর, হার্ভেস্টার, অটোমেটিক হ্যামার—এককথায়, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার শান্ত, কল্যাণময় মূর্তি।

সেই যন্ত্রমুক্তি ও মানবমুক্তির আবির্ভাব আমরা দেখছি পৃথিবীর একটি অংশে—সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে। যন্ত্রবিদ্বেষ আজ সেখানে মানুষের মন থেকে অন্তর্ধান করছে। মানুষের অন্তরে আজ যন্ত্র সমাসীন। শিল্প ও 'কাব্যের উপেক্ষিতা' যন্ত্র আজ শিল্পীর অনুভূতিতে প্রতিস্পৃত হয়ে প্রতিরূপবেশে কাব্যে শোভা পাচ্ছে। তাই সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশের কবিও 'রেলঘুম' রচনা ক'রে—ট্রেনের ইঞ্জিনের বিস্ময় ব্যক্ত করেন। জীবন্ত, দুরন্ত ট্রেন ছাড়ল :

টং—টং—ভোঁ—ভস্
টু—ডাউন ছাড়ে ; ব্যস।
ভস্ ভস্ ঢক্কোর,
চলে খায় টক্কোর।

ট্রেন ছোট একটি স্টেশন পার হ'চ্ছে—

ধকা ধাঁই ধকা ধাঁই,
এখানে থামিতে নাই!
ঝকা ঝকা ঝাঁকি ঝাঁকি
অমন করুণ আঁখি!

কেমনে সে দিল ফাঁকি ?
আর তারে পাব নাকি !
ধক্ ধক্ ধক্কা,
সব কি রে ফক্কা !

পুলের উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে—

ঘস্—গড়্ গুড়্ গুম্,
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুম্,
বর্ষার মরসুম্
নদী জলে বড় ধুম,—

ট্রেন পুল পার হ'ল—

ঘচাঘচ্ ঘড়োব,
লোহা-বাঁধা পথ তোর, ...
উঁচু নীচু গর্ত্ত'র
পথ নয় পথ তোর ;—
লোহা-বাঁধা পথ তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর !

তারপর পয়েণ্টস্ ক্রসিং—

ঘচাঘচ্ ঘটা ঘাঁই,
সে পথে ত আর নাই।
পেরেছি গো, পেরেছি গো,
সে পথটা ছেড়েছি গো।

… ঘ্যাস ঘ্যাস্—ঘট্‌কা
কের লাগে ধট্‌কা।
কি বলছে? হুত্তোর—
লোহা-বাঁধা পথ তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর।

দূরে সিগন্যাল ডাউন্ করেছে—
ঘস্ ঘস্ ঘচ্চান্,
দূরে ছায় হাতছান্।
কেমনে দিগন্তে
কে পেরেছে জান্‌তে?
আশুবারি আন্‌তে
এই পথ-প্রান্তে
লাগে হাতছান্‌তে।—

এ কাব্য নয়, সুর। এ সুর যন্ত্রের, কোকিলের নয়। তাই ব'লে 'কুহু কুহু'-র চাইতে এর মর্য্যাদা কম কিসে? বাংলার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-এর ট্রেনের সুর নয়, যন্ত্রের সুর। কাব্যময় যন্ত্রের বন্দনা, কোকিল আর যন্ত্র যেখানে কবির কাছে এক। তাই আজকের কাব্যে যদি 'cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!' না শুনে ফ্যাক্টরীর সাইরেন্, হর্ন, যন্ত্রের শব্দ শুনি, তা হ'লে বিস্মিত হব কেন? যদি কাব্যের প্রতীক ও প্রতিরূপ দেখি যন্ত্রের, তা হ'লে সে-কাব্য কেন রসোত্তীর্ণ হবে না? অবশ্য রসিক পাঠকের মন যদি ক্রীতদাস বা সামন্ত গোষ্ঠীর যুগ আঁকড়ে থাকে, তা হ'লে যন্ত্রের প্রাণ, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহিমা

তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হবে কি ক'রে? কি ক'রে তিনি বুঝবেন কাব্যের এই জীবন্ত উপমা,

Drink from here energy and only energy,
As from the electric charge of battery...

—*Stephen Spender*

Somewhere beyond the railheads
Of reason, south or north.

—*C. Day Lewis*

বাংলার ইঞ্জিনিয়ার-কবির 'রেলঘুম' আর স্পেণ্ডার-এর 'The Express' বা ল্যুই আরাগোঁর 'Red Front' পড়ে' কি ক'রে তিনি উপলব্ধি করবেন যন্ত্র-প্রাণের স্বর?

After the first powerful plain manifesto,
The black statement of pistons, without more fuss
But gliding like a queen she leaves the station.

—*The Express*

ভবিষ্যতের যন্ত্রমুক্ত ও মুক্তমানবসমাজে যন্ত্রের যে মহা-কাব্য ও মহাসঙ্গীত রচিত হবে, তাতে যন্ত্রের যান্ত্রিক বিবর্ণতা দূর হয়ে বৈচিত্র্যময় হবে যন্ত্র। যন্ত্র হবে যন্ত্রাতীত, প্রাণবান। যন্ত্র পাশবিক মূর্ত্তি পরিহার ক'রে হবে মানবিক। ভবিষ্যতের শিল্পী এই যন্ত্র-টাইটানের মুক্তির গান গাইবেন। একদিন নতুন কোন বিঠোফেন্ যন্ত্রের ও মানবতার এই অবাধ মুক্তির ও সাম্যের নবম সিম্ফনি রচনা করবেন। সেদিন আগামী দিন।

জীবন কি? দিল্লীকা লাড্ডু

'জীবন' কি? এ-প্রশ্নটা বারবার আমার মনে জেগেছে। চিন্তাজগতে আমি একজন-ভবঘুরে, তাই চারিদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে এই ধরণের এক গভীর দার্শনিক প্রশ্ন আমার মনে জাগা খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম সেদিন গদাই চন্দরকে এই প্রশ্ন করতে দেখে। হালে গদাইয়েরও মনে হয়েছে, বাস্তবিক মানুষের জীবনটা কি? আমি বললাম, 'তোমার কি মনে হয়, গদাই?' গদাই বললে গম্ভীর চালে ঘাড় নেড়ে 'দিল্লীকা লাড্ডু, দাদাবাবু! যো খাতা হ্যায় উ পস্তাতা হ্যয়, যো নেহি খাতা হ্যয় উভি পস্তাতা হ্যয়।' দেখলাম গদাইয়ের ডেফিনিশন প্রায় কাণঘেঁষে গিয়েছে। অর্থাৎ 'জীবন' এমনই চিজ যাকে ফাঁকি দেবার ক্ষমতা নেই, অথচ যাকে আলিঙ্গন ক'রে আনন্দ পেতে হ'লে অনেক অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বাহুবল

চাই। বাধ্য হয়ে তাই ভাবতে শুরু করলাম, সত্যি 'জীবন' কি ? লক্ষ লক্ষ লোক রণদামামার তালে তালে চলেছে এই 'জীবন'কে বিসর্জ্জন দিতে, দিচ্ছেও, ভ্রূক্ষেপ নেই, দিকবিদিক জ্ঞান নেই। আলোকশুভ্র শিশুর দেহ বেয়নেটে বিঁধে তুলে ধরছে তারা নির্ব্বাক মায়ের নিষ্পলক চোখের সামনে, দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলছে, 'এই তো জীবন !' তালে তালে পা ফেলছে লক্ষ লক্ষ লোক, হাতে কামান-বন্দুক নিযে লক্ষ লোকের বুকের দিকে তুলে' ধরে খিল খিল ক'রে হাসছে, টোটা ফুটছে আর বলছে, 'এই তো জীবন।' লক্ষ লোক বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যারিকেড গঠন ক'রে, টোটা-বর্ষণ বুক পেতে নিচ্ছে আর বলছে, 'এই তো জীবন !' আর চেখভের ক্ষতবিক্ষত 'ডার্লিং'-এর দল উপদংশের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরতে মরতে বলছে, "তোমাদের সভ্যতার সমস্ত বিষ পান করছি আমরা নীলকণ্ঠের মতো, এই তো জীবন।" আমি ভাবছিলাম, খেয়ে-দেয়ে সাহিত্যিকদের গাজনে কাঁসি বাজিয়ে দিন কাটছিল বেশ, হঠাৎ এ-প্রশ্ন মাথায় এলো কেন ? না খেয়ে খেয়ে মাথাটিও হয়েছে এমন নাছোড়বান্দা যে, একবার কোন প্রশ্ন পেলেই অমনি হন্যে কুকুরের মতো তার পিছু পিছু তাড়া করবে। ...

কাঠ, কয়লা, লোহা, আলু, পটল—এসব কি প্রশ্ন করলে সোজা উত্তর দেওয়া যায়, কারণ এদের নীরেট অস্তিত্ব রোজই চোখে পড়ছে। যদি বলা যায় 'ঢেউ' কি, তারও উত্তর দেওয়া যায় সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে, যদিও প্রতিটি ঢেউয়ের বারিবিন্দুর মধ্যে তফাৎ অনেক। 'সুর' কি, এ-প্রশ্নের উত্তর রীতিমত কঠিন হ'লেও, দেওয়া যায়। সুরের পর্দ্দার ওঠানামা, বা স্বরগ্রাম শুনে বলা যায় ভৈরবী, আশাবরী অথবা

মূলতান। কিন্তু ঠিক 'সুর' কি ডিফাইন করা কঠিন। তার চেয়েও কঠিন যদি বলি 'সবুজ' কি, 'হলদে' কি। সবার চেয়ে কঠিন হ'ল 'জীবন' কি? দার্শনিক নই, পণ্ডিতও নই, একেবারে সাদাসিদে মানুষ, আদার ব্যাপারী, দার্শনিক তত্ত্ববোঝাই জাহাজের খবর রাখি নে, রাখতে চাইনে। তাই আমার উত্তরও হবে একেবারে সিদে বুনো বেদেদের তীরের মতো, যুক্তির যুযুৎসুর প্যাঁচ কষার ক্ষমতা নেই। ...

যতদিন 'যন্ত্র' আবিষ্কৃত হয়নি ততদিন যা নড়ে, যা চলে মানুষ তাকেই বলেছে 'জীবন', অর্থাৎ যা 'জঙ্গম' তাই 'জীবন'। যন্ত্রযুগের আগে জীবনের এর চাইতে আর ভাল ব্যাখ্যা কেউ করতে পারেনি। কিন্তু যখন যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'ল এবং দেখা গেল, মোটরও নিজে চলে, বাষ্পীয় পোতও নিজে চলে, তখন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগলো, 'জীবন কি তা হ'লে যন্ত্র?' দার্শনিক দেকর্তে (Descartes) বললেন, মানুষ, জীবজন্তু সবই যন্ত্র, তফাৎ শুধু এই যে, মানুষ-যন্ত্রের 'আত্মা' আছে, যে-আত্মা মস্তিষ্কের একাংশে প্রভুত্ব করে এবং মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অনেকে বললেন, তাও নয়, জীবন একটা জটিল যন্ত্র ছাড়া আব কিছু নয়। বৈজ্ঞানিকেরাই তখন এই কথা বেশী ক'রে বলেছিলেন, তাই দার্শনিকেরাও তাঁদের তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছিলেন এই যান্ত্রিকতার উপর। ...

আমরা অবশ্য এ-যুক্তি বা এ-ব্যাখ্যা মানি নে। না মানলেও এক সময় কেন 'জীবন' সম্বন্ধে মানুষের এই ধারণা হয়েছিল তা ভেবে দেখা উচিত। ভেবে দেখলে দেখা যায় 'জীব' আর যন্ত্রের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে জীবনকে মনে হয়েছিল 'যন্ত্র'। সাদৃশ্যটা কি এবং কোথায়?

ধরা যাক, একটা কুকুর। কুকুরের ব্রেনে প্রায় ৫ কোটী সেল (cell) আছে, প্রত্যেকটি সেলের সঙ্গে আরও অনেকগুলির যোগ আছে, আবার সবগুলোর সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ আছে নার্ভের (nerve) মারফৎ। একটি কুকুরের চোখের নার্ভের মধ্যে প্রায় একলক্ষ তন্তু (fibres) জড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি তন্তুর আলাদা বাণী পাঠাবার ক্ষমতাও আছে। অনেকটা টেলিফোনের তারের মতো। তেমনি মানুষের হাড়গুলো (bones) লিভারের (lever) মতো। যেমন, যখন আমরা মুখ বন্ধ করি জোরে তখন বেশ বুঝতে পারি গালের তলায় পেশী সঙ্কুচিত হ'চ্ছে, নীচের চোয়ালটা ঠেলে উঠছে। আরও একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, চোয়ালটা কানের কাছে স্কালের (skull) সঙ্গে যেন স্ক্রু দিয়ে আঁটা। হার্ট রক্ত পাম্প করছে, চোখ অনেকটা ক্যামেরার মতো কাজ করছে। এই রকম ঠিক যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য আছে যথেষ্ট এবং সে-সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নয়। তা হ'লে মানুষ কি যন্ত্র ? ...

মানুষ যন্ত্র নয়। কেন নয় ? যন্ত্রের যে সব কলকব্জা, নাটবল্টু,—সব খণ্ড খণ্ড ক'রে খুলে নেওয়া যায়, আবার জোড়া দিয়েও নেওয়া যায়। মোটরগাড়ী যখন বাইরে থেকে চালান আসে তখন যন্ত্রপাতি খোলা অবস্থায় আসে, এখানে ইঞ্জিনিয়াররা তাকে 'ফিট' ক'রে নেন। মানুষের দেহের সব অংশ কি এইভাবে খুলে নিয়ে আবার 'ফিট' করা যায় ? যায় না। মোটরের একটা বিশেষ কোন কল বিকল হয়ে গেলে ইঞ্জিনিয়াররা তা বুঝতে পারেন এবং বদলে নতুন কল দেন। মানুষের দেহে এ রকম কোন বদল চলে কি ? খানিকটা চলে, যেমন—আজকাল

আর্টিফিসিয়াল্ হার্ট বসিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা হ'চ্ছে, জন্তুর ফুসফুসও ব্যবহার করা হ'চ্ছে। কিন্তু পুরো চলে না। যেমন একঠেঙে হরিকে শ্যামের একটা ঠ্যাঙ জুড়ে দু-ঠেঙে করা যায় না। মিথ্যে দাঁত বসিয়ে দাঁত বার ক'রে হাসতে পারি, একজনের রক্ত আর একজনকে ধার দিতে পারি, কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারি না। কেন পারি না? একটা উদ্ভিদকে (plant) খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে পুঁতে দিলে আবার গজিয়ে উঠবে। কিন্তু এই উদ্ভিদ্ পর্য্যন্তই। উচ্চতর প্রাণীকে, (higher animal) যেমন মানুষকেও তেমনি খণ্ড খণ্ড করলে জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ মানুষের দেহযন্ত্রের প্রতিটি অংশ আর একটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক অংশেরও নিজস্ব জীবনের ধারা আছে, ক্ষুদ্র কোষটির (cell) পর্য্যন্ত। ...

তা হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ এমনই এক যন্ত্র যার খোয়াঘষা (wear and tear) সে নিজেই পূরিয়ে নেয়, যার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (self-regulation) এবং আত্ম-সংস্কারের (self-repair) ক্ষমতা আছে। মানুষের দৈহিক তাপ-নিয়ন্ত্রণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বড় দৃষ্টান্ত। যখন আমরা খুব গরমের মধ্যে থাকি তখন রক্ত প্রবাহের গতি বেড়ে যায় এবং গাড়ীর রেডিয়েটারের মতো দেহও তাপ বার ক'রে দেয়। তখন আমরা ঘামি। তাতেও যখন হয় না, তখন ঠাণ্ডা জায়গায় যাই। তেমনি আত্ম-সংস্কারের ভাল দৃষ্টান্ত হ'চ্ছে, মানুষের দেহের চামড়া বা ক্ষতস্থান। ক্ষত ভাল হয়, নতুন চামড়া আবার তাকে ঢেকে দেয়। একটা যন্ত্রের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের খানিকটা শক্তি থাকে, যেমন ঘোড়ার বেগ বা বাষ্পের চাপ (steam pressure),

কিন্তু তার অন্যান্য যন্ত্রপাতি মোটামুটি অপরিবর্ত্তনীয় এবং সলিড। মানুষের তা নয়। মানুষের হাড় পর্য্যন্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকে। একটা বাড়ী বা একটা প্রস্তরমূর্ত্তি যে-রকম স্থির, মানুষের জীবন সে-রকম স্থির নয়। মানুষের জীবনকে বরং তুলনা করা যায় অগ্নিশিখার সঙ্গে, জলপ্রপাতের সঙ্গে। যন্ত্র থেকে আমরা অনেক দূরে চলে আসিনি কি ? ...

মানুষের মন (mind) যখন বিচার করি তখন মানুষকে একেবারেই যন্ত্র বলা যায় না। মনের নিজের একটা ধর্ম্ম আছে। ভাব, চিন্তা, সংবেদন, অনুভূতি, ভালবাসা, ঘৃণা এসবের মধ্যে মনের একটা নিজস্ব বৃত্তিগত ঐক্য আছে। কিন্তু এই নিজস্বতা, স্বকীয়তা থাকা সত্ত্বেও মন সম্পূর্ণ দেহের উপর নির্ভরশীল। ভাববাদী (idealist) বা মনোজগতের শ্রেষ্ঠতা-বাদীরা নাক সিঁটকোবেন না। কথাটা দয়া ক'রে শুনুন। ঠ্যালার নাম বাবাজী ! মন যে কতটা দেহের উপর নির্ভরশীল তা বুঝতে একটুও কষ্ট হবে না। মস্তিষ্কের কোন অংশ থেকে যদি রক্ত-প্রবাহের শিরা কেটে দেওয়া যায় তা হ'লে কি হয় ? তা হ'লে বুদ্ধিমান মানুষ আপনি অল্প-দিনের মধ্যেই একটি বোকাপাঁঠা বনে' যাবেন্ এবং চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখবেন। মাথার সামনে গোলাকার উন্নতাংশ (lobes) যদি বাদ দিতে হয় (অনেক সময় টিউমার হ'লে দেবার দরকার হয়) তা হ'লে সব থাকতেও আপনি উদ্যোগী হয়ে কিছু করবার শক্তি পাবেন না, অর্থাৎ initiative হারাবেন। তেমনি মস্তিষ্কের কোন অংশ যদি জখম হয় একদিন ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে, দেখবেন স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে, কোন কিছুই মনে করতে পারছেন না, এমন কি বাপের নাম পর্য্যন্ত। সুতরাং

মন (mind) দেখা যাচ্ছে মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল, আবার মস্তিষ্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে গোটা দেহযন্ত্রের। মনের যে স্বাধীনতা, যে স্বকীয়তা, যে ঐক্য আছে, যন্ত্রের কিন্তু একেবারেই তা নেই। যন্ত্র আজও দেহগত মনের ধার ঘেঁষে যেতে পারেনি। ...

তা হ'লে 'জীবনটা' শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে কি ? **যান্ত্রিকতা** (mechanism) **এবং ব্যক্তিত্ব** (individuality)—**এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির সমন্বয়** (synthesis) **হ'চ্ছে মানুষের 'জীবন'**। মানুষ যন্ত্র আবার 'ব্যক্তি'ও। বিশ্ববিখ্যাত জীব-বৈজ্ঞানিক হ্যাল্‌ডেন্‌ সাহেবও (J. B. S. Haldane) তাই বলেছেন :—"Life...seems to be a synthesis of two opposites—mechanism and indviduality A man is a machine, and at the same time an individual." একজন বৈজ্ঞানিক 'seems to be' ছাড়া আর কিছু বলতে পারেন না, বিশেষ ক'রে জীব-বৈজ্ঞানিক। কারণ জীব-বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণার প্রেরণা ও লক্ষ্য হ'ল এই প্রশ্ন—**'জীবন কি ?'**

জীবন কি ? —

(পুনরালোচনা)

জীবন কি ?

মানুষ যন্ত্র, আবার মানুষ ব্যক্তিও।

প্রশ্ন হতে পারে, কতটা ব্যক্তি, কতটা যন্ত্র ?

উত্তর খুব সহজ না হ'লেও খুব জটিল নয়। কারণ ব্যক্তির ও জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, প্রায় সবক্ষেত্রেই যান্ত্রিকতা (mechanism) থেকে ব্যক্তিত্বের (individuality) দিকে তার প্রগতি।

একটা গাছের ব্যক্তিত্ব অনেক কম, কারণ তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে মাটিতে পুঁতে দিলেও আবার গাছ গজিয়ে ওঠে। তেমনি নিম্নতম শ্রেণীর জীবের মধ্যেও দেখা যায় ব্যক্তিত্ব তাদের অনেক কম। একরকমের সামুদ্রিক জীব (Sea-anemones) ও চাপ্‌টা কৃমি জাতীয় পোকা (flatworm) আছে যাদের খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেললেও প্রত্যেকটি

অংশ জীবিত থাকে। উচ্চশ্রেণীর জীবদের এভাবে খণ্ডিত করলে তারা মরে যায়। যেমন একটা ব্যাঙ দুভাগে কেটে ফেললে দুটোই মরে যাবে, কিন্তু সেই ব্যাঙের ডিম যদি প্রথমাবস্থায় দুভাগে কেটে ফেলা হয় তা হ'লে দুটি ছোট ছোট ব্যাঙাচি জন্মাবে, মরবে না। তেমনি মানুষের ভ্রূণও (human embryo) যদি প্রথমাবস্থায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তা হ'লে একই রকমের 'যমজ' সন্তান জন্মায় এবং বেঁচেও থাকে।

তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে যে, জীবজগতের নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে অথবা উচ্চশ্রেণীর নিম্নতম অবস্থায় ব্যক্তিত্বের চাইতে যান্ত্রিকতাই হ'চ্ছে বেশী। কিন্তু জীবজগতের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যান্ত্রিকতার চাইতে ব্যক্তিত্বই বেশী। অর্থাৎ যান্ত্রিকতা থেকে ব্যক্তিত্ব, পূর্ণতর ব্যক্তিত্বের দিকেই জীবজগতের ক্রমবিকাশ। জীবনের যাত্রা পূর্ণতর ব্যক্তিত্বের পথেই।

জীবজগতের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় জীবন দু'টি স্তরে সংগঠিত। অণুবীক্ষণ দিয়ে জন্তু বা গাছপালা দেখলে দেখা যায় যে, অসংখ্য চৌকো চৌকো বাক্স ইটের মতো সাজানো আছে। মানুষ বা জীবের দেহের মধ্যে এই যে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট কুঠরি এরই নাম 'সেল' (cell)। এর খানিকটা জেলির মতো হড়হড়ে, যার নাম প্রোটোপ্ল্যাজম (protoplasm)। এরই মধ্যে আবার অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখা যায় স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলীয় অংশ রয়েছে যার নাম সাইটোপ্ল্যাজম্ (cytoplasm); তারই মধ্যে রয়েছে বিন্দুর মতো কোষকেন্দ্র (nucleus); তার পাশে আরও ছোট তারার মতো বিন্দু

সেন্ট্রোসোম্ (centrosome); কোষকেন্দ্রের মধ্যে ধূলিকণার মতো বা পাকানো দড়ির মতো কতকগুলি ছোট ছোট ক্রোমোসোম (chromo-some); আর এসবের বাইরে রয়েছে খোলস বা প্রাচীর যার নাম সেল্-ওয়াল (cell-wall)। সেল সাধারণত এত ছোট যে তাদের ২৫০০ পর পর একলাইনে সাজলে তবে এক ইঞ্চি জায়গা লাগে। অথচ এইটুকু জায়গার মধ্যেও তাদের স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার সব ব্যবস্থাই আছে। একটা বড় প্রাণী বা মানুষের মধ্যে কোটি কোটি সেল স্বাধীনভাবে বেঁচে আছে এবং সুশৃঙ্খল ভাবে পরস্পর সহযোগিতা ক'রে মানুষকে সজীব রেখেছে। এই স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার কথা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। মনে হয়, গোটা পৃথিবীটা ছোট ছোট সোবিয়েতে বিভক্ত হ'লে যে সংযুক্ত সোভিয়েট মহারাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়ে উঠবে তাকে পরিচালনা করাও সহজ, কিন্তু জীবন যে কোটি কোটি সেল দিয়ে গড়া তারা কেমন ক'রে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে এমন সুশৃঙ্খলভাবে সহযোগিতা করতে পারে যাতে জীবনের বৃদ্ধি ও প্রসার সম্ভব হয়!

প্রত্যেকটি সেলের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং কোটি কোটি সেলের সুশৃঙ্খল পারস্পরিক সহযোগিতা—এই হ'ল জীবনের গোড়ার কথা।

ডিম, স্পার্মাটোজা, পরাগ (pollen), প্রত্যেকটি এক-একটি সেল। প্রজনন জীবধর্ম। এই জীবধর্মের বশেই স্ত্রী-পুরুষ

মিলন হয়। মিলিত হয় কে? পুরুষের জননকোষ স্ত্রীর ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর ডিম্বকোষটি এ্যামিবার সেলের মতো বাড়তে থাকে। এইভাবে সৃষ্টি হয় নূতন একটি প্রাণী, নূতন একটি জীবন।

এ তো গেল জীব-বৈজ্ঞানিকের কথা। এবার রাসায়নিকের দু-একটা কথা শোনা যাক। কারণ জীবনের অনেকখানি রসায়ন।

জীবন্ত প্রাণী মাত্রেই নড়েচড়ে বেড়ায়। জীবন হ'চ্ছে গতি (motion)। এই গতি কখন অতিক্রত, কখন অতি মন্থর। পাখিও ওড়ে, আবার গাছও বাড়তে থাকে। এই নড়াচড়ার শক্তি যোগায় কে! বাইরের প্রাকৃতিক উপাদান। কেমন ক'রে যোগায়?

প্রত্যেক বস্তু অণুসমষ্টি। জীবমাত্রেরই অপঘটন (katabolism) ও উদ্‌ঘটনের ক্ষমতা আছে। শরীরের মধ্যে অনবরত এই অপঘটন ও উদ্‌ঘটন চলতে থাকে। যার সাহায্যে গড়ার কাজ চলে তাকে বলে উদ্‌ঘটন (anabolism), আর যার সাহায্যে ভাঙা বা ক্ষয়ের কাজ চলে তাকে বলে অপঘটন (katabolism)। আমাদের শরীরের রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ (glucose) বলে' একরকমের চিনি আছে, তার রাসায়নিক গঠন হ'চ্ছে C6 H12 O6—অর্থাৎ গ্লুকোজের একটি অণুর মধ্যে আছে ৬ ভাগ কার্বন ১২ ভাগ হাইড্রোজেন ও ৬ ভাগ অক্সিজেন। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে হাওয়া থেকে অক্সিজেন নিচ্ছি, সেই অক্সিজেন রক্তের ভিতরে যাচ্ছে। অক্সিজেনের কাজ হ'চ্ছে যে-কোন পদার্থের সঙ্গে

মিশে তাকে ভাঙাগড়া। গ্লুকোজের ৬ ভাগ কার্বনকে অক্সিজেন ভেঙে নিয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ (CO_2) গ্যাস্ তৈরী করে। বাকি যা থাকে তা থেকে কয়েকটি জলের অণু তৈরী হয়। চিনির প্রত্যেক অণুকে এইভাবে ভাঙাগড়ার মধ্যে অনেকখানি শক্তি সঞ্চার হয়।

উদ্‌ঘটন দুরকমের আছে। যেমন একরকমের উদ্ভিদ্ আছে যা মাটি থেকে শিকড় দিয়ে জল ও নাইট্রেট্ টেনে নেয় ও পাতা দিয়ে বাইরের হাওয়া থেকে নেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড্, তারপর সূর্য্যের আলোর সাহায্যে তাকে ভেঙে চিনি ও অন্যান্য শক্তিসঞ্চারক পদার্থে পরিণত করে। আবার আর একরকমের প্রাণী ও উদ্ভিদ্ আছে যারা সূর্য্যের তাপের সাহায্য না নিয়েই এই উদ্‌ঘটনের কাজ করে। জন্তুরা সাধারণত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট্ প্রভৃতি কতকগুলি জৈব পদার্থ অক্সিজেন দিয়ে ভেঙে বা দহন ক'রে (oxidise) শক্তি সঞ্চয় করে। আর উদ্ভিদ্‌রা খনিজ পদার্থ নিয়ে তাকে প্রথমত জৈব পদার্থে পরিণত করে, তারপর করে ভাঙাচোরা। অর্থাৎ কয়লা পুড়িয়ে (oxidising coal) বাষ্পীয় শক্তি সঞ্চয় ক'রে যেমন স্টীম-ইঞ্জিন চলে, তেমনি খাদ্য পদার্থ অক্সিডাইজ ক'রে তার থেকে শক্তি সঞ্চয় ও ব্যয় ক'রে জন্তুরা বেঁচে থাকে। যে-সব জীব বা উদ্ভিদ্ অক্সিজেন্ ব্যবহার ক'রে বেঁচে থাকে তাদের বলে বায়ুজীবী বা aerobes, এবং যারা অক্সিজেন্ ব্যবহার করে না তাদের বলে অবায়ু-জীবী বা anaerobes. এই শেষোক্ত অবায়ুজীবীর দলের মধ্যে পড়ে অধিকাংশ ব্যাধি ও অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধের ব্যাক্টিরিয়া (bactéria)। ঈস্ট্ (yeast) যদি প্রচুর অক্সিজেন পায় তাহ'লে চিনি তৈরী করতে

পারে, কিন্তু অক্সিজেন্ না পেলে ঈস্ট, এল্‌কহল (alcohol) ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভেঙ্গে যায়।

তা হ'লে রাসায়নিকের দৃষ্টিতে জীবনকে কি দেখতে পাচ্ছি? প্রত্যেক জীবন্ত পদার্থই একটা বিশেষ ধরণের রাসায়নিক যৌগিক (a particular pattern of chemical compounds) এবং প্রত্যেক জীব বা জীবন হ'চ্ছে একটা বিশেষ ধরণের রাসায়নিক রূপান্তর (a particular pattern of chemical change)।

সবচেয়ে সরল রাসায়নিক রূপান্তরের দৃষ্টান্ত আমরা জানি অগ্নিশিখা (flame)। একটা মোমবাতির শিখার আকার প্রায় একই রকম থাকে। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে এর বিভিন্ন অংশে নানারকমের পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হ'চ্ছে। এই শিখার সঙ্গে জীবনের মূলগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শিখার রূপান্তর সরল, জীবনে রূপান্তর অনেক জটিল। একটা হুইস্‌লের শব্দের সঙ্গে কোন গ্র্যাণ্ড অপেরা বা সিম্‌ফনির শব্দ-বিরোধ, সমন্বয় ও স্বর-সঙ্গতির পার্থক্য যতখানি, জীবনের সঙ্গে শিখার বিরামহীন রূপান্তরের পার্থক্যও ঠিক ততখানি।

একটা কথা আছে—উপমা দুর্ব্বল যুক্তি। তা হ'লেও শিখার সঙ্গে জীবনের তুলনা যুক্তি হিসাবে সবল। কারণ

শিখাকে যন্ত্রের মতো পৃথক পৃথক অংশে ভাগ ক'রে বিচার করা যায় না, অথবা থামিয়ে বা নিভিয়ে দিয়ে আবার উস্কানো যায় না। পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরই শিখার অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। জীবনেরও ধর্ম্ম তাই।

জীবন শুধু পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর নয়, অভিযোজনও (adaptation) বটে।

শুধু রাসায়নিক নয়, বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তনও ঘটছে অহরহ আমাদের দেহের মধ্যে নার্ভগুলিতে। একগোছা ইলেকট্রিক কেবলের মধ্যে যেমন অনেক তার গোছা বাঁধা থাকে, মেরুদণ্ডের ভিতর তেমনি নার্ভসেলের মোটা গোছা আছে। পেটের কাছ থেকে বেরিয়ে এই নার্ভের গোছা মাথার মগজের মধ্যে চলে গিয়েছে। দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সীমান্ত থেকে বার্ত্তা বহন ক'রে টেলিফোনের তারের মতো নার্ভগুলো চলে গিয়েছে মগজের ভিতরে। মগজটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এবং সেখানে অপারেটাররাও আছে। তারা আবার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে নার্ভের মারফৎ পেশীর সঙ্গে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া নয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়াও। যেমন: আমি হাত নাড়তে আরম্ভ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতের পেশীগুলোতে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হ'ল। পেশীগুলো অক্সিজেন্ ব্যবহার করতে লাগলো। যদি তখন বাড়তি অক্সিজেন্ সরবরাহ

ক'রে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তাগিদ মেটানো না হয় তা হ'লে অঘটন ঘটতে পারে, অর্থাৎ হাত অসাড় হয়ে যেতে পারে। তা যাতে না হয় সেই জন্যে তখন হাতে রক্ত সঞ্চালন বেশী ক'রে আরম্ভ হ'ল। হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস একটু দ্রুত তালে বাড়ল। শুধু অক্সিজেন নয়, রক্ত থেকে পেশীগুলো চিনিও নিল। এই চিনি এল যকৃতের (liver) সঞ্চিত স্টক্ থেকে। এই যে সব এত কাণ্ড হ'ল এ সবই কিন্তু মগজের তত্ত্বাবধানে।

এবারে দেখা যাক জীবনের অপূর্ণতা কি আছে, কারণ প্রতিবেশের সঙ্গে জীবনের অভিযোজন সবসময় সম্পূর্ণ নয়। দেহের এমন অনেক অঙ্গ (organ). আছে যাদের আজকাল কোন কাজ নেই, একরকম বেকার বলা চলে। যেমন উদ্ভিদের মধ্যে ড্যাণ্ডিলিয়ন (dandelion)। ড্যাণ্ডিলিয়নের পরাগ হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদের পরাগ ডিম্বককে (ovule) উর্ব্বর (fertilise) করে, যার ফলে বীজ হয়। ড্যাণ্ডিলিয়নের পূর্ব্বপুরুষদের পরাগ নিশ্চয়ই এই প্রজননের কাজে লাগত, কিন্তু এখন ড্যাণ্ডিলিয়ন্ যৌন-প্রজননক্রিয়া পরিত্যাগ করেছে। তাই তার পরাগ নষ্ট হয়ে যায়।

মানুষেরও এই রকম অনেক অঙ্গ আছে যা আজকাল আর কোন কাজে বিশেষ লাগে না। যেমন পায়ের নখ। পায়ের নখের কোন কাজ নেই, বরং সভ্য সমাজে অকাজ করার আছে অনেক কিছু। এ ছাড়া ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) ও বৃহদন্ত্রের (large intestine)

সন্ধিস্থলে অ্যাপেণ্ডিক্স (appendix) নামে একটি ছোট্ট আঙুলের মতো অংশ তার গা থেকে ঝুলে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা আজও এই অ্যাপেণ্ডিক্সের কাজ কি জানেন না। অ্যাপেণ্ডিক্স ফুলে উঠে মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে বলে' ডাক্তাররা একে কেটে বাদও দেন।

এইরকম অনেক জন্তুর অনেক অঙ্গ আছে যাদের একদিন হয়ত কোন-না-কোন কাজ ছিল, কিন্তু আজ তারা বেকার। বেকার মাত্রই বিপজ্জনক, সুতরাং তাদের এমনি অলসভাবে থাকাটাও নিরাপদ নয়।

দেহের কোন কোন অঙ্গ যেমন আজ অকেজো তেমনি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়াও আছে যার আজ কোন বিশেষ কাজ নেই। তা ছাড়া, জীবনের অভিযোজনও (adaptation) অসম্পূর্ণ। যেমন চোখের বিভিন্ন অংশ ঠিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সব সময় খাপ খাওয়াতে পারে না বলেই নকলচক্ষু বা চশ্‌মার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে অভিযোজন হয় তাও সাময়িক, চিরস্থায়ী নয়। তা না হ'লে গাছপালাই বা শুকিয়ে যাবে কেন, আর আমরাই বা বৃদ্ধ হব কেন এবং মরব কেন ?

জীবনের এই অপূর্ণতা ব্যষ্টির দিক থেকে অনিষ্টকর, কিন্তু সমষ্টি বা সমগ্র জীবনের দিক থেকে একান্ত আবশ্যক। কারণ তা না হ'লে ক্রমবিবর্ত্তনই সম্ভব হত না। এ-সত্য প্রথম ডারুইনই উদ্ঘাটিত করেছিলেন।

বিজ্ঞানীদের মতে ক্রমবিবর্ত্তনের প্রধানত তিনটি সর্ত্ত আছে। প্রথমত, কোন জাত কখন তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পুরোপুরি

অভিযোজিত হবে না, মোটামুটি আদর্শ অভিযোজিতের কাছাকাছি থাকবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির বিনাশ প্রয়োজন প্রকৃতির নূতন পরীক্ষার জন্যে। তৃতীয়ত, ব্যক্তির অতি-উৎপাদন অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন, কারণ তা না হ'লে যারা অপদার্থ তাদের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে (natural selection) উচ্ছেদ হবে না। এই সর্ত্তের প্রত্যেকটি ব্যক্তির দিক থেকে ক্ষতিকর, কিন্তু প্রগতিশীল ও ক্রমবিবর্ত্তনের ঊর্দ্ধপথযাত্রী জাতির বা জীবশ্রেণীর পক্ষে কল্যাণকর।

ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে প্রত্যেক জীবজন্তু ও উদ্ভিদ এক একটি মূর্ত্তিমান ইতিহাস বিশেষ। একটা দেশ বা জাতির ইতিহাসের চাইতেও এ-ইতিহাস অনেক, অনেক বেশী সুদীর্ঘ। অতীতের অনেক স্বাক্ষর ও অবশেষ আজও প্রত্যেক জীবের মধ্যে রয়েছে যার কোন ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তা নেই,আবার অনেক ধীর পরিবর্ত্তনের (variations) ও আকস্মিক পরিবর্ত্তনের (mutation) সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে যা এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ। পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ হলেও হতে পারে। তবে না-হবার সম্ভাবনাই বেশী। পৃথিবীর অন্যতম জীব-বৈজ্ঞানিক হাল্‌ডেনের ভাষায়, "It is at once an anachronism and an experiment."

তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত জীবন কি ? এ-প্রশ্নের উত্তর কোথায় ? গদাইয়ের উত্তরই প্রায় ঠিক দেখা যাচ্ছে। 'জীবন' বাস্তবিকই 'দিল্লীকা লাড্ডু'। গদাই ও কার্ল মার্কসের জীবন-দর্শন বা জীবন সম্বন্ধে দর্শন প্রায় একই। কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু ভাবতে ভাল।

জীবন কি ?

জীবন কতকগুলি বিরোধের বাণ্ডিল।

যান্ত্রিকতা ও ব্যক্তিত্ব, উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যহীনতা, স্থির ও শান্তিময় পূর্ণতা এবং অস্থির ও সংগ্রামশীল পরিবর্ত্তনশীলতা ও অপূর্ণতার মাঝামাঝি কিছু-একটা হ'চ্ছে জীবন।

অবিরাম পরিবর্ত্তনশীলতা জীবনের ধর্ম্ম, কিন্তু এর প্রত্যেকটি প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ঐতিহাসিক, সুনির্দ্দিষ্ট, খোদিত।

মৃত্যু ও বিনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামই জীবন, কিন্তু মৃত্যুই এর প্রগতির পাথেয়।

শান্তির মধ্যে অশান্তি, জড়তার মধ্যে জঙ্গমতা, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য ও সঙ্গতি, বিরোধ ও বন্ধুরতার মধ্যে প্রগতি--এই হ'ল জীবন।

সবার উপরে জীবন সর্ব্বজয়ী জীবন। মৃত্যু স্বীকার করেও মৃত্যুজয়ী, জড়তা স্বীকার করেও জঙ্গম, বিরোধ আলিঙ্গন করেও বৈপ্লবিক অগ্রগতি—এই হ'ল জীবন।

নিষ্কৃতি নেই জীবনের কবল থেকে। কার্ল মার্কস্ বলেছেন, আর গদাই বলেছে:

'জীবন কি ?—দিল্লীকা লাড্ডু।